অনভ্যস্ত

– মনির আহমেদ

নীলা আমার আত্মীয়া। ক্লাস নাইনে পড়ে। রমজানের ঈদ উপলক্ষে বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। বেড়ানোর চেয়েও তাকে দেখার গোপন আগ্রহ আমার বেশি ছিল। মা–বাবার একমাত্র মেয়ে। বয়কাট চুল, শ্যামলা শরীরের রঙ, ছটফটে চাল–চলন। তাকে আমার খুব ভালো লাগে।

হয়তো এ ভালো লাগাটাই ভালোবাসার প্রাথমিক স্তর। গেস্ট রুমে বসে আছি। তার আম্মু কিচেনে। এই সময় নীলা তার আম্মুর একটা শাড়ি পরে রুমের দরজায় এসে দাড়ালো।

শাড়ি পরার বয়স হয়নি এই অজুহাতে তার জন্যে এখনো শাড়ি কেনা হয়নি। দেখে বোঝা যায় আজই প্রথম পরেছে। শাড়ির এক পাশ উপরে, এক পাশ নিচে। বারো হাত লম্বা শাড়ি, এরপরও তার শরীর ঢাকতে পারেনি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্লাউজ ও পেটিকোটের বিকল্প হিসেবে সালোয়ার–কামিজ পরেছে।

বললাম, নীলা, তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে যে কেউ ভাববে মেয়েটি পাগলি।

শুনে সে তো লজ্জায় লাল। ভেতরে এনে বললাম, তোমাকে শেখাবো কিভাবে শাড়ি পরতে হয়। শাড়ি পরাবো বলে কোমরে হাত দিতেই সে এক লাফে দূরে সরে গেল।

বললো, আমার কাতুকুতু লাগে।

লাঞ্চ পর্যন্ত আর সামনেই এলো না।

দুই মাস পরে চিঠির মাধ্যমে তার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ দিয়েছে। জন্মদিনে নীলাকে কি গিফট দিতে পারি? অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলাম, একটা শাড়ি গিফট দেবো।

শাড়ির প্যাকেটের ওপর নাম ঠিকানা লিখে টেপ দিয়ে একটা গোলাপ লাগিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় উপস্থিত হলাম তাদের বাসায়। গিয়ে দেখি অল্প কয়েকজন মাত্র অতিথি।

কেক কাটার পর খাওয়ার পর্ব শেষে সবাই চলে গেল। নীলা আমাকে থাকতে বলতেই রাজি হয়ে গেলাম। শুয়ে আছি কিন্তু ঘুম আসছে না। ছটফট করছি। রাত প্রায় দুটোর দিকে হাতে শাড়ি নিয়ে নীলা আমার রুমে এলো।

জেগে আছি দেখেই বললো, আজ শাড়ি পরিয়ে দেবেন না? কাছে টেনে কোমরে হাত দিতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু দিতে লাগলো। শারীরিক উত্তেজনায় আমরা হারিয়ে গেলাম।

শাড়ি আর পরানো হলো না।

সকালে নাশতা খেয়ে বিদায় নিয়ে বাড়িতে এসে শুনি ছোটমামা আমার বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য সউদি থেকে ভিসা পাঠিয়েছেন। আনুষঙ্গিক কাজ সেরে টিকেট কনফার্ম করে প্রেম–প্রীতি, ভালোবাসা, মায়ের আদর, বাবার স্নেহ, মাতৃভূমির মায়া সব কিছু ছেড়ে একটু আর্থিক উন্নতির আশায় আজ সাড়ে ছয় বছর সউদি আরবে আছি।

আই অ্যাম সরি নীলা।

সুখে থেকো।

হাফ লেডিস

– মীর মফিজুল ইসলাম

আমি তখন ক্লাস এইটে। আমাদের স্কুলটি ছিল ছেলেদের। স্কুলে নাটক হবে জানতে পারলাম। স্কুলের নাটকে মেয়ে চরিত্রগুলো ছেলেদেরই মঞ্চায়ন করতে হতো। অজানা আনন্দ, উৎকণ্ঠা নিয়ে বাছাই কমপিটিশনে গেলাম। আমার আপেল চেহারার গুণে নায়িকা চরিত্র পেলাম। নিয়মিত রিহার্সাল চলছে। মহড়ার মধ্যে শিখে নিলাম মেয়েদের হাসির ঢং, লজ্জাবতী নারীর আচলে ঢাকা মুখ, আরো অনেক কিছু। দিনের পর দিন মহড়া চলছে। আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকলো। নাটকের দিন–ক্ষণ ঠিক হলো। এলাকার মাথা, হাত, পা, সদৃশ ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সাগ্রহ সম্মতি দিলেন। পাশের স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলীও নিমন্ত্রণ পেলেন। বহিঃপ্রস্তুতি মোটামুটি সুসম্পন্ন। কাল নাটক।

ইংরেজি বর্ণমালা এল (L) সদৃশ স্কুলের উত্তর–দক্ষিণ দিকের মাঝের পার্টিশন খুলে বিরাট হলরুম তৈরি হলো। সকাল দশটায় অনুষ্ঠিত হবে নাটক *রক্তে ভেজা মাটি।*

আমরা সকাল আটটায় ফাইনাল রিহার্সাল দিলাম। চমৎকার অভিনয় প্রত্যেকের। প্রত্যেকেরই স্ক্রিপ্ট ঝরঝরে মুখস্ত। প্রস্তুতিতে আমরা মুগ্ধ। মঞ্চ সাজানো হলো শাড়ি দিয়ে। জানতে পারলাম নাটকের প্রতি দৃশ্য শেষে পর্দা টেনে মঞ্চ ঢেকে দেয়া হবে। প্রথমেই অভিনেতাদের পরিচয় পর্ব। মঞ্চের আড়াল থেকে যখন প্রত্যেক অভিনেতার নাম ঘোষিত হবে তখন সে মঞ্চে গিয়ে চরিত্র অনুযায়ী একটা ডায়লগ দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যাবে। পরিচয় পর্ব শেষে পর্দা টেনে দেয়া হবে। তারপর শুরু হবে নাটকের মূল অংশ।

সাড়ে নটায় আমাদের কস্টিউম পরা শেষ। এখন মেকাপ দেয়া হচ্ছে। বদরাগী হিসেবে খ্যাত সমীরস্যার আমার ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষছেন আর বিরক্ত হচ্ছেন। বুঝতে পারলাম না ঠোঁটে লিপস্টিক লাগানোর মতো আদুরে কাজটার সঙ্গে বিরক্তির কি সম্পর্ক আছে।

সোয়া দশটা। হল ভর্তি মানুষ। প্রথম সারিতে এলাকার বিশিষ্ট চিন্তাবিদরা বসেছেন, পেছনে অন্যান্য দর্শক। পর্দা খুলে গেল, অডিয়েন্সের হাততালিতে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো। আমাদের ক্ষুদে শিল্পীরা একে একে মঞ্চে উঠছে আর ছোট একটা ডায়লগ দিয়ে চলে আসছে। এক সময় আমার নাম ঘোষিত হলো। আমি অপূর্ণ এক নারী, মঞ্চের দিকে এগোতে থাকলাম। সমস্যা হলো অতীতে শার্ট–প্যান্ট পরে নায়িকার অভিনয় করেছি। শাড়িতো জীবনে এই প্রথম। তাই সহজে হাটাচলা করতে পারছিলাম না। সব সময় মনে হতে থাকলো শাড়ি এই বুঝি খুলে যাবে।

অতঃপর মঞ্চে উঠলাম এবং আপন ডায়লগ দিয়ে একটা লেডিস মার্কা হাসি দিলাম। মঞ্চের সামনে বসেছিল বিচ্ছু টাইপ কয়েকটা ছেলে। আমাকে দেখে একযোগে ভেংচি কাটলো। কেউ একজন বলে উঠলো, *হাফ লেডিস!* আমার হাসি পেল। হাসি লুকাতে দ্রুত মঞ্চ ছাড়তে যাচ্ছিলাম তখনই ঘটলো

সেই ঘটনা। শাড়ির কুচিতে পা আটকে গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেলাম। ধুপ করে আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা পড়ে গেল।

সমীরস্যার দৌড়ে এলেন, অন্যরাও এলো। পেছনে ডানপিটে ছেলেদের অট্টহাসি। অডিয়েন্সে মৃদু গুঞ্জন। আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সমীরস্যার ঝুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তার ঠোটে সিগারেট। কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে বসলাম। স্যার ছুটে এলেন, ফিশ ফিশ করে বললেন, বাবু পারবি?

বললাম, পারবো স্যার।

সবার মধ্যে চাঞ্চল্য ফিরে এলো। শুরু হলো প্রথম দৃশ্যের মঞ্চায়ন। তৃতীয় দৃশ্য থেকে আমার দখল। তাই সমীরস্যার আমাকে রিমেকাপ দিলেন, শাড়ির কুচি ঠিক করতে গিয়ে স্যারের হাতের সুরসুরি দাত চেপে সহ্য করলাম। স্যার শাড়ি ধরে হাটা শেখালেন। মঞ্চে উঠলাম। বিচ্ছুদের আবার ভেংচি। আমি অবিচল ডায়লগ আউড়ে গেলাম। কিন্তু প্রথম ধাক্কার কারণে নিপুণ হলো না অভিনয়। নাটক শেষ হলো। নিজের মনঃপূত না হলেও অনেক বাহবা পেলাম। বাড়ির সবাইকে সারপ্রাইজ দেবো ভেবে ড্রেস চেঞ্জ না করেই রওনা দিলাম। পেছনে বিচ্ছু বাহিনী আমাকে *হাফ লেডিস, হাফ লেডিস* বলে গলার সুখ করে নিচ্ছে। আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন!

বিরক্তির চরম সীমায় পৌছে মনে হচ্ছিল শাড়ি উচিয়ে দেখিয়ে দিই আমি হাফ, নাকি ফুল?

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

স্মৃতিপটে

– এসএম বজলুল হক

১৯৬৮ সালে ইপিআর ট্রেনিং নিতে গেলাম। ট্রেনিং শেষে বাড়ি আসার সময় বেতন পেলাম ২২৫ টাকা। মায়ের জন্য তেরো টাকা দিয়ে একটি ভালো শাড়ি কিনলাম। বাড়ি এলাম। আমার বাড়ি আসার কথা শুনে প্রতিবেশীরা অনেকে এলো। সুটকেস খুলে মাকে শাড়িটা বের করে দিলাম।

শাড়িটি হাতে নিয়ে মা অবাক হয়ে বললেন, এতো টাকার শাড়ি কিনলে কেন খোকা?

মাকে বললাম, আমার আনন্দ পেতেই এই শাড়ি কেনা।

মা আর কোনো কথা বললেন না। আমাকে খেতে দিলেন। খাওয়া শেষ করে ছোটবেলার মতোই মায়ের শাড়ির আচল দিয়ে হাত–মুখ মুছলাম। মা যে আনন্দ পেতেন তা অনুভব করতাম।

১৯৭১ সাল। তখন ভারতে অবস্থান করছি। আমি সে সময় একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। একদিন আমার সঙ্গে আরো তিনজনকে নিয়ে অপারেশনে এলাম। কাজ শেষ করে সঙ্গীদের বললাম, চলো আমার বাড়ি হয়ে যাই।

সবাই রাজি হলো। আমার বাড়ির উঠানে পা দিয়ে মা বলে ডাকতেই মা ঘর থেকে নেমে এলেন। আমাকেসহ আমার সঙ্গীদের সবার মুখ মোছালেন মায়ের শাড়ির আচল দিয়ে। এবং আমাদের জবের ছাতু খেতে দিলেন। ছাতু খেয়েই মায়ের শাড়ির আচলে হাত মুছলাম।

মা আমার সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বললেন, দেখো বাবা আমার ছেলের কাণ্ডখানা।

মায়ের কাছ থেকে আমরা সবাই বিদায় নিলাম। চেয়ে দেখলাম মায়ের চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। মা তার শাড়ির আচল দিয়ে চোখের পানি মুছছেন। দেশ স্বাধীন হলো। ফিরে এলাম মায়ের শাড়ির স্নেহের আচল তলে।

১৯৭৪ সালের নভেম্বরে বিয়ে করলাম। আমার বিয়ের পর মা আট বছর বেচেছিলেন। মা বেচে থাকাকালে আমার স্ত্রীর জন্য শাড়ি কেনার সময় মায়ের জন্যও একটি শাড়ি কিনতাম। মা যাতে শাড়ির অভাব অনুভব না করেন সেদিকে আমার লক্ষ্য থাকতো।

মা যখন মরণপথের যাত্রী তখন আমি আমার মায়ের পাশে বসে আছি। মা আমাকে তার পাশে বসে কোরআন শরীফ পড়ার আদেশ দিলেন। মায়ের পাশে বসে সুরা ইয়াসিন পড়ছি। মা চোখ বুজে আমার পড়া শুনছেন। এক সময় আমার চোখের পানি অঝোরে ঝরতে লাগলো। পড়া গেল থেমে। এমন সময় মা চোখ মেলে আমার পানে চাইলেন। অতি কষ্টে মায়ের শাড়ির আচল দিয়ে আমার চোখ মোছালেন। এরপর মা আমাদের মধ্যে থেকে বিদায় নিলেন।

গাংনী, মেহেরপুর থেকে

জন্মদিনের পোশাক

– নুরু

রেনু আমার ছোট বোনের একমাত্র ননদ। অনেক দিন আগে থেকে হালকার ওপর ঝাপসা সম্পর্ক থাকলেও ঘনত্বটা বাড়তে শুরু করেছে বছর দেড়েক। বেশ স্বাস্থ্যবতী এবং এ অবস্থার উন্নতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। কিছুটা অহঙ্কারী। পুরোটাই ভীতু। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। কিন্তু তার এ ভালোবাসা মাঝে মধ্যে থমকে দাড়ায় মায়ের শাসনে কিংবা পিতার ধমকে অথবা ভাইয়ের রক্তচক্ষুতে। তাদের যখন বাসায় বেড়াতে যাই তখন বাসায় সময় দিতে পারে না মা বাবা ভাই বোনের ভয়ে। আবার বাইরে দেখা করতে পারে না পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের ভয়ে। প্রায় তিন মাস ধরে কোনো চিঠিপত্র নেই। ভাবলাম হয়তো অসুখ করেছে। বাসায় গিয়ে দেখি স্বাস্থ্য আরো বেড়েছে। জানতে চাইলাম চিঠি দাওনি কেন।

বললো, মা নিষেধ করেছেন তাই। তুমি যে আমাকে বিয়ে করবে তার কি গ্যারান্টি আছে?

এরপর তার মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে কিছু আশা, কিছু ভরসা দিয়ে আবার প্রেমের তরী ভাসালাম। মায়ের অনুমতি নিয়ে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে প্রেম বলা যায় কি না জানি না। শুধু জানি তাকে ভালোবাসি।

২২ অক্টোবর তার জন্মদিন। তার জন্ম দিনের উপহার হিসেবে কিনেছিলাম আমার প্রিয় রঙ নীল রঙয়ের শাড়ি। কিন্তু এটা তার জন্মদিনে দিতে পারিনি। ছুটি ছিল না এজন্য। গিয়েছিলাম রোজার ঈদের পর। বললাম, তোমার জন্য জন্মদিনের পোশাক এনেছি, পরতে হবে।

সে ভেংচি কেটে বললো, যে পোশাক পরে জন্মগ্রহণ করেছি তা বাসর রাতে পরাতে পারো।

বললাম, আরে না, না, তোমার জন্য জন্মদিনের উপহার হিসেবে একটি শাড়ি এনেছি। পরিয়ে দিতে চাই।

শালার শখ কতো, বলে শাড়িটা নিয়ে তার ঘরে ঢুকে দরজায় কপাট লাগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর বলে উঠলো, পরতে পারছি না তো।

কারণ এর আগে কখনো সে শাড়ি পরেনি।

বললাম, আমি আসবো?

খবরদার উকি দেবে না। তার কণ্ঠে শুনলাম। এরপর তার আম্মাকে অনুরোধ করে পাঠালাম।

যখন দরজা খুললো তখন তাকে অপূর্ব লাগছিল। শাড়ির আচলের সঙ্গে মিলিয়ে মেরুন রঙয়ের লিপস্টিক পরেছিল। এরপর তার আম্মাকে চা খাওয়ানোর অনুরোধ জানিয়ে রুমের বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম, চোখ বন্ধ করো।

সে চোখ বন্ধ করলো।

পকেট থেকে নেকলেসটা বের করে নিজ হাতে পরিয়ে দিলাম।

চোখ খুলে চমৎকার একটা হাসি দিয়েছিল।

যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে এই মেয়েকে ভালোবাসি কেন? তাহলে একটাই উত্তর, তার হাসি আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এজন্যই। এরপর বললাম, বিনিময়ে কি কিছুই দেবে না?

বললো, চোখ বন্ধ করো।

চোখ বন্ধ করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত এক অনুভূতির ছোয়া পেলাম। অর্থাৎ আমার ডান গালে ৮৭ কেজি ওজনের একটা চুমু বসিয়ে দিল।

বললো, চোখ খোলো।

বললাম, চোখ খুলতে পারছি না কেন? চোখের বাম পাশের তালা যে এখনো বন্ধ।

আর দুষ্টুমি করতে হবে না বলে দুই হাতে আমার মুখ ঘুরিয়ে বাম গালে ৮৮ কেজি ওজনের আরেকটি চুমু।

এরই মধ্যে ডাক পড়লো চা আনতে। আমি বের হচ্ছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আমার শার্টের কলার চেপে ধরে বললো সোনার চাদ, যাচ্ছো কোথায়?

কেন, চা আনতে।

আয়নাটা আমার সামনে ধরে বললো, এগুলো কি?

দেখলাম আমার দুই গালেই তার পুরো ঠোটের মেরুন রঙয়ের চমৎকার আল্পনা আকা। এরপর শাড়ির আচল দিয়ে মুছে দিল।

আমি চা নিয়ে এলাম। অনেকক্ষণ জমিয়ে আড্ডা দিলাম। গোপনে কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। এদিনটি মনে পড়লে আজো বেশ মজা পাই।

ইদানীং তার পরিবার বিয়ের জন্য খুব চাপ দিচ্ছে। গোপনে কাজটা সেরে ফেলার জন্য অনেকগুলো শাড়ি কিনেছি তার জন্য। এগুলো আমার আলমারিতে শোভা পাচ্ছে। জানি না, কোনোদিন সে সুযোগ আসবে কি না। তবে আমার পরিবারের দৃপ্ত শপথ এ সম্পর্ক হতেই পারে না।

এরই মধ্যে রেনুর আচরণ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। সে আমাকে এতোই ভালোবাসে যে সপ্তাহে দুইটি টাকা খরচ করে একটি চিঠিও দিতে পারছে না। সে গ্যারান্টি চায়।

বিয়ে যদি একমাত্র গ্যারান্টি হয় তাহলে ভালোবাসাহীন বিয়ে ভেঙে চুরমার হয় কেন? ভালোবাসাহীন সংসার অশান্তির আগুনে পুড়ে ছাই হয় কেন? রেনুর মনে কি আছে জানি না। তবে আমার পক্ষে আর কাউকে জন্মদিনের পোশাক পরানো সম্ভব হবে না।

চট্টগ্রাম থেকে

বেদনাময় সেই দিনটি

– নীলা

পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতির জন্য একটি ঐতিহ্যবাহী দিন। এই দিনটিতে প্রত্যেক বাঙালি চায় একটু আনন্দ করতে। সেদিন আমারও শাড়ি পরে বের হওয়ার কথা ছিল। শাড়ি পছন্দ করি না। কিন্তু অন্যকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখতে ভালো লাগে। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু অর্থাৎ আমার প্রিয় মানুষটি পহেলা বৈশাখের দুই দিন আগে আমাকে শাড়ি পরার জন্য অনেক অনুরোধ করে। তারপরও রাজি হইনি। সে শাড়ি খুবই পছন্দ করে। সে জন্য আমাকে বারবার অনুরোধ করেছিল। তারপর অনেক ভেবে পরদিন ফোন করে তাকে বলে দিই যে আমি শাড়ি পরবো।

সে খুবই খুশি হয়।

প্রতীক্ষার সময় পার হয়ে আসে পহেলা বৈশাখ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ। সকাল থেকেই প্রবল আশা নিয়ে বসেছিলাম কখন শাড়ি পরে বাইরে বের হবো। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। কিন্তু শাড়ি আর পরা হয় না। কারণ আমার বাবা সেদিন বাসায় ছিলেন সে জন্য বের হতে পারিনি। বাইরে শাড়ি পরে বের হলেই সন্দেহ করবেন সেই কারণে বের হইনি। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় তখন মনের ভেতরে জমানো কান্নাগুলো চোখ দিয়ে পানি আকারে বের হয়ে আসে। মনে মনে ভাবি, জীবনে প্রথম শাড়ি পরবো বলে মনস্থির করি – কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, পরতে পারিনি।

শাড়ি পরা অবস্থায় নিজেকে কল্পনা করি। কিন্তু আমার এ কল্পনা কল্পনাই থেকে যায়, বাস্তবে রূপ নেয় না। তাকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি সে জন্য নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছে। জীবনে এই প্রথম

তাকে শাড়ি পরার কথা দিয়েও তা রাখতে পারিনি। তার সঙ্গে আর কখনোই এমনভাবে কথা দিয়ে ভঙ্গ করিনি। সে জন্য নিজেকে কেবলই অপরাধী মনে হয়।

এখন শাড়ি দেখলেই মনে হয়, সেদিন তাকে কথা দিয়ে শাড়ি পরতে পারিনি। তাই কোনোদিন শাড়িই পরবো না। শাড়ি না পরতে পারার কারণেই এদিনটি আমার জীবনে বেদনাময় দিন হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মিরপুর, ঢাকা থেকে

মশারি

– আসমা আক্‌তার

সবাই বলে আমি নাকি রূপসী নারী। রূপসী করেছে আমার অমুক পৃন্ট শাড়ি, অমুক পৃন্ট শাড়ি, এই ধরনের বিজ্ঞাপন যখন টিভিতে প্রচার করা হয় তখন সব নারীর মনেই শাড়ি পরার বাসনা উকি দেয়। মিসেস হিলারি ক্লিনটনও বাংলাদেশে এসে বাঙালি নারীকে শাড়ি পরতে দেখে নিজেও শাড়ি পরে নেচেছিলেন মনের আনন্দে।

আমি যখন প্রথম শাড়ি পরি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। গ্রামের স্কুলের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সব বান্ধবীরা মিলে ঠিক করলাম অনুষ্ঠানের দিন শাড়ি পরবো। বড়আপাকে চিঠি লিখে জানালাম। আপা তার সদ্য কেনা একটি শাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

অনুষ্ঠানের দিন শাড়ি পরে কেমন যেন লজ্জা লাগছিল। অথচ এ শাড়িই নাকি বাঙালি নারীর অন্যতম ভূষণ। একরাশ লজ্জা নিয়েই বাড়ির মুরুব্বিকে সালাম করে স্কুলে গেলাম। প্রথমে স্যারকে দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। একে একে সব ছাত্রীরা শাড়ি পরে আসাতে কিছুটা সহজ হলাম। কিছু আনন্দ, কিছু বেদনা নিয়ে হই চই করে বাড়িতে ফিরছি হঠাৎ জুতার মাথায় শাড়ি টান লাগতেই ক্ষেতের মধ্যে পড়ে গেলাম। হায়! ততোক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। শাড়ির নিচের অনেকখানি অংশ ছিড়ে গেল। কিছুদিন পর আপা যখন জানলেন যে, তার নতুন শাড়ি দেহত্যাগ করেছে দেহে উঠার আগেই তখন আইন জারি করে দিলেন আমাকে আর তার শাড়ি পরতে দেয়া হবে না।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী লাল টুকটুকে শাড়ি পরে গেলাম স্বামী গৃহে। নতুন বৌ সারাক্ষণ একটা বারো হাত কাপড়ের নিচে নিজেকে বন্দী করে রাখতে হয়। তা না হলে যে মান থাকে না।

কয়েক মাস পর এলো ঈদ। সে বললো, কাল তোমাকে নিয়ে শপিংয়ে যাবো। রেডি হয়ে থেকো।

সারা রাত কতোভাবে কতো কি ভাবলাম। কি শাড়ি কিনবো? প্রথম ঈদ। আত্মীয়স্বজন সবাই যাতে চমকে যায় এমন শাড়ি কিনবো।

পরদিন বিকেলে গাউসিয়া মার্কেটে গেলাম। প্রথমেই ঢুকলাম জামদানির দোকানে। একবার ইডেন কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আত্মীয়া মঞ্জুআপার একটা জামদানি পরেছিলাম। বান্ধবীরা সবাই এতো প্রশংসা করেছিল যে, সেই থেকে মনে মনে ভেবেছিলাম একটা জামদানি কিনবো। তাই জামদানির দোকানে ঢুকলাম।

জামদানির লাইন থেকে একটা শাড়ি পছন্দ করলাম। দাম কতো জানতে চাইলে দোকানদার বললো, দুই হাজার টাকা।

শুনে সে বললো, কি বলেন ভাই? মশারির দাম এতো?

দোকানদার তো থ! আমিও অবাক। বিশ্ববিখ্যাত জামদানিকে বলে কি না মশারি?

গেলাম অন্য দোকানে। অনেক ঘুরে সবশেষে একটা শাড়ি পছন্দ হলো। কিন্তু দাম শুনেই সে চট করে বলে উঠলো, এতো দাম দিয়ে শাড়ি কেনার দরকার আছে? যতো সব ঘোড়া রোগ। চার পাচশ–র মধ্যে নিলে নাও।

দোকানদাররা মুখের দিক তাকিয়ে আছে। লজ্জা, ঘৃণা, অপমানে কান্না পাচ্ছে। কেউ দেখে ফেলার আগেই বেরিয়ে এলাম মার্কেট থেকে। বাসায় এসে অনেকক্ষণ কাদলাম। সামান্য একটা শাড়ির জন্য এতো বড় অপমান? টাকার সমস্যা হলে আমাকে বললেই পারতো? জীবনে প্রথম শপিং–এ গেলাম তার সঙ্গে। আর সে কি না!

অন্য রুমে গিয়ে কেদে কেটে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি বাইরের দরজা ভেড়ানো। সে অফিসে চলে গেছে। উঠে হাত মুখ ধুয়ে নাশতা খেয়ে গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়ছি। কাজের ছেলেটা রান্না করছে। কিছু ভালো লাগছে না। দুপুরে সে এলে কথা বলবো না বলে ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, সন্ধ্যা হলো, সে আসছে না। ধীরে ধীরে রাগ পরিণত হলো অনুরাগে। ছিঃ, ছিঃ! সামান্য একটা শাড়ির জন্য এমন করলাম? খুব অস্থির লাগছে আর মনে মনে আল্লাহকে ডাকছি। খোদা আমার শাড়ি লাগবে না। ওকে সহি সালামতে ফিরিয়ে আনো।

রাত সাড়ে দশটায় কলিংবেলের শব্দে প্রায় দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি একটা শাড়ির প্যাকেট হাতে নিয়ে দাত বের করে হাসছে। ঘরে এসে প্যাকেটা হাতে দিলে বললাম, এটা কি?

বললো, তোমার সেই পছন্দের শাড়িটা। প্যাকেটটা খোলার আগেই চোখ থেকে দুফোটা অশ্রু ভিজিয়ে দিল শাড়ির প্যাকেটে।

আজো জানি না সে অশ্রু আনন্দের ছিল, নাকি অভিমানের? তবে আজো আমি চার পাচশ টাকার বেশি দাম দিয়ে শাড়ি কিনি না।

বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম থেকে

তেল

–মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী

একটি অফিসে আমার এক বন্ধুর কাজে গেলে অফিসের কর্তাব্যক্তিটির সঙ্গে আমাদের মনমালিন্য দেখা দেয়। কর্তাব্যক্তিটি এক পর্যায়ে বলে ফেলেন, আপনাদের কাজ আমি করে দেবো না, যা পারেন করেন। আমার উপরে লোক আছে। আপনারা আমাকে কিছুই করতে পারবেন না।

অফিস থেকে বের হয়ে আসার সময় দেখি আমাদের এলাকার একটি ছেলে ওই কর্তার ব্যক্তিগত পিয়ন। তার সঙ্গে আমাদের সমস্যার কথা আলাপ করতেই সে বলে, আমার স্যারকে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। কারণ দুর্নীতিবাজ অফিসার হলেও স্যারের খুটির জোর শক্ত। তবে আপনারা যাতে উদ্ধার হতে পারেন সে জন্য একটি পথ বলে দিই, কাজ হতে পারে।

আমরা পথটি কি বলতেই সে বললো, স্যার তেল মারা খুব পছন্দ করেন। তাছাড়া বিবিসাহেবের প্রতি স্যার খুব দুর্বল।

বললাম, কিভাবে তেল মারবো এবং বিবি সাহেবকেই বা কোথায় পাবো।

সে বললো, আপনারা দামি একটি শাড়ি কিনে আনবেন। সেটা আমি বিবিসাহেবকে পৌছে দেবো এবং আপনাদের জন্য স্যারকে সুপারিশ করতেও বলবো।

আমার বন্ধুটি যেন হাপ ছেড়ে বাচলো। পিয়ন ছেলেটিকে বন্ধু বললো, আমি শিগগিরই শাড়ি নিয়ে আসবো। এবার তেল মারার ব্যাপারটি বলো।

পিয়ন ছেলেটি বললো, স্যারের সঙ্গে আলাপের শুরুতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন। স্যারকে আপনাদের আগের ব্যবহারের জন্য দুঃখিত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন এবং বলবেন, এই অফিসে স্যারের মতো ভালো লোক আর কখনো আসেনি।

বেশ কয়েকদিন পর দামি শাড়িটি পাঠিয়ে অফিসের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতেই আমাদের সহাস্যে তিনি স্বাগত জানালেন। পিয়ন ছেলেটির কথামতো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলাম। আমার চেয়ে আমার বন্ধুটিকে লক্ষ্য করলাম, সে তেল মারায় দক্ষ। এখানে বলে রাখা দরকার, পিওনটি আমাদের এও বলেছিল, স্যারকে তেল মারার সময় লক্ষ্য রাখবেন কখন স্যার পা দুটো নাড়ানাড়ি করেন। সে সময়ই আপনাদের কাজটির কথা আপনারা উল্লেখ করবেন। তাই তেল মারার ফাকে ফাকে আমরা তার পা দুটোর দিকে লক্ষ্য রেখেই চলেছি কখন পা দুটো নড়ে। এভাবে ঘণ্টাখানেক অপ্রয়োজনীয় ও তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় শব্দ দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করতে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এ জন্য প্রস্রাব করার কথা বলে বেরিয়ে পড়ি। আরো কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করি, আমার, বন্ধুটি হাসিমুখে বেরিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে, কাজ হয়েছে, শালা পা নাড়ছে।

রাজনগর, হবিগঞ্জ থেকে

লাল থেকে লাল

– মানিক

তখন বাবার হোটেলে খাই। ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে পড়ি। বাবার দেয়া সামান্য পকেট খরচ ছাড়া আয়ের কোনো রাস্তা আমার জানা ছিল না। অর্থাৎ বাবার ওপর নির্ভরশীল বেকার টিনএজ তরুণ আমি।

ছোট থেকেই চাচাতো বোন সুমনাকে ভালো লাগতো। বড় হলে আমাদের সেই ভালোলাগা রূপ নেয় প্রেমময় ভালোবাসায়। দুইজন দুজনাকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসি। একজন অন্যজনকে একদিন

না দেখলে থাকতে পারি না। অবশ্য আমাদের প্রেমে পারিবারিক স্বীকৃতি ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে কোনো বাধা ছিল না বলে আমাদের প্রেম ছিল অবাধ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে আড্ডা দিতাম। এভাবেই চলছিল আমাদের ভালোবাসার পর্ব। সামনে টেস্ট পরীক্ষা থাকার কারণে মাঝখানে তার সঙ্গে দেখা–সাক্ষাৎ কম করতাম।

একদিন তাদের বাসায় গিয়ে জানলাম সে তার বড়খালার বাড়িতে বেড়াতে গেছে। কবে নাগাদ আসবে তা বলতে পারে না। প্রায় পনেরো বিশ দিন পর সে এলো। সংবাদ পেয়ে তার কাছে গেলাম। দেখলাম আমাকে সে এড়িয়ে চলছে। তার মাঝে আগের মতো আবেগ উচ্ছ্বাস আর নেই। রাগ করে সেদিন চলে এলাম। দুদিন পর আবার গেলাম। তাকে ঘরে ডাকলাম। আমাকে এভাবে এড়িয়ে চলার কারণ জানতে চাইলে সে বললো মানিকভাই, তোমাকে কিছু সত্য কথা বলবো। জানি না তুমি কিভাবে নেবে।

বললাম, হেয়ালি রেখে কি বলবি বল।

বললো, আমার বিয়ে তোমার সঙ্গে হবে না।

তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

বললো, আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

এবার না হেসে পারলাম না। মনে করলাম আমাকে রাগানোর জন্য সে মিথ্যা বলছে। বললাম, মিথ্যা বলার আর জায়গা পাসনি।

সে বললো, আমি মিথ্যা বলিনি। খালার বাসায় বেড়াতে গেলে তার দেবরের ছেলে আমাকে পছন্দ করে খালার কাছে প্রস্তাব দিলে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই। কারণ সে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। আর তুমি বর্তমানে বাবার হোটেলে বসবাসকারী একজন বেকার তরুণ মাত্র। তোমার জন্য অন্তত পক্ষে পাচ বছর অপেক্ষা করতে হবে। তাই খালার কথায় কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলি।

এবারও হাসলাম।

বললাম, তা ছেলেটির নাম কি?

বললো তার নাম আমির হোসেন।

সে আরো কিছু বলার আগেই তার গালে বেশ জোরে চড় বসালাম। সে মেঝেতে পড়ে গেলে আরো মারলাম। সে কাদলো না, চুপ করে বসে রইলো। ঘর থেকে চাচি ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। বড়ভাবীকে পাঠালেন। তিনি এলে তাকে সব কিছু খুলে বললাম। এবং এও বললাম, আজ এ মুহূর্তে একে বিয়ে করবো। তোমরা বিয়ের ব্যবস্থা করো।

সুমনাকে ভাবী জিজ্ঞাসা করলে সে সব কিছু অস্বীকার করে বললো, আমাকে পরীক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলেছে।

ভাবীকে বললাম সত্য–মিথ্যা কিছু বুঝি না। আজ তাকে বিয়ে করবো এটা আমার শেষ কথা।

ভাবী বললেন, তুমি এখন বেকার, তোমার বাবা মা হয়তো তোমার এ অসময়ের পাগলামি মেনে নেবে না। তখন তোমার বৌকে খাওয়াবে কি? আর বিয়ে করতে হলে বৌয়ের জন্য শাড়ি, চুড়ি

আনতে হবে। তোমার কাছে তো টাকাও নেই। কিভাবে আনবে? সুমনা তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তাকে এখনি বিয়ে করতে হবে কেন, সে তো আকাশে উড়াল দেয়নি। দুই পরিবারের সবাই যখন রাজি তখন আগে লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত হও পরে বিয়ের কথা ভাবা যাবে। সুমনাকে ভর্ৎসনা করে ভাবী চলে গেলেন।

মারের কথা সে ভুলে গেল। কাছে এসে বুকে মাথা রেখে বললো, তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো তা আগে বুঝতে পারিনি। তোমার সঙ্গে অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করো।

তাকে বিশ্বাস করলাম। ভাবলাম একটু আগে সে যা বলেছে তা স্রেফ আমাকে রাগানোর জন্য। তাকে বললাম, তুই জানিস না, আমার কাছে তুই কতোটুকু, তোর জন্য আমি যা ইচ্ছা তাই–ই করতে পারি। প্রয়োজনে মানুষও খুন করতে পারি।

সে বললো, বিয়ের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দাও। তোমার আছি, তোমারই থাকবো চিরকাল।

বললাম তা না হয় বাদ দিলাম। আর মাত্র চার দিন পরে আসছে নববর্ষ সেদিন তুই লাল শাড়ি পরে বৌ সেজে থাকবি। তোকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। রিকশায় চড়ে দুজনে সারা শহর ঘুরে বেড়াবো।

সে বললো, লাল শাড়ি পাবো কোথায়, যেদিন তুমি লাল শাড়ি নিয়ে আসবে সেদিন পরবো।

বললাম, ঠিক আছে, নববর্ষের দিন তোর জন্য লাল শাড়ি নিয়ে আসবো, নিজ হাতে তোকে শাড়ি পরিয়ে বৌ সাজাবো।

সে বললো ঠিক আছে তুমি নববর্ষের দিন লাল শাড়ি নিয়ে এসো তখন দেখা যাবে। তবে একটি শর্ত এ চার দিন তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে না।

শাড়ি নিয়ে আসবো বলে সেদিনের মতো চলে এলাম। শাড়ি কেনার জন্য টাকা যোগাড় করতে বাবাকে মিথ্যা বলে তার কাছে থেকে প্রাইভেট পড়ার অগ্রিম ১,৫০০ টাকা নিলাম। এবং নববর্ষের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম। চার দিন আমার কাছে চার বছর মনে হলো। প্রতি রাতে তাকে স্বপ্ন দেখতাম আমার দেয়া লাল শাড়ি পরে রিকশায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি দুজনে।

অবশেষে এলো নববর্ষের দিন। বাজার থেকে এক হাজার টাকা দিয়ে একটি লাল শাড়ি কিনে বিকেলে তাদের বাসায় গেলাম। আমার কাছে মনে হলো কোনো ভুতুড়ে বাড়িতে এসেছি। কারো মুখে নেই হাসি, নেই কারো মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য। সবাই যেন স্থবির। কারো মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কোনো কথা না বলে সোজা ভাবীর ঘরে চলে গেলাম। তাকে সুমনার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে নিরুত্তর। উত্তর না পেয়ে ঠায় দাড়িয়ে রইলাম।

তার খালাতো বোন রুমা এসে আমার হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললো, এটা পড়। তবেই সব জানতে পারবি। চিরকুটটি খুললাম। এতে সুমনা লিখেছে –

মানিকভাই, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। তোমার দেয়া ভালো শাড়ি আমার আর পরা হলো না। আর হয়তো কোনোদিন হবেও না। সেদিন যা বলেছিলাম তা সবই সত্যি ছিল। খালার বাড়ি বেড়াতে গেলে আমির হোসেনের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে খালার কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেয়। খালা আমাকে বোঝায় এবং বিয়ের ব্যবস্থা করে। খালার কথাতেই বিয়েতে রাজি হয়ে যাই। মনে

করেছিলাম, সব কিছু তোমাকে খুলে বলবো। চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু তুমি শুনলে না। উল্টো পাগলামি করে আমাকে বিয়ে করতে চাইলে। তোমাকে ঠকাতে চাইনি বলে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে নিজের ভাগ্যকে সম্বল করে আমির হোসেনের হাত ধরে চললাম। জানতাম তুমি আমাকে ভালোবাসো। তবে এতো ভালোবাসবে তা জানতাম না। যখন জানলাম তখন আমার কিছুই করার নেই। পারতাম আমির হোসেনের কথা না বলে তোমাকে বিয়ে করতে। কিন্তু তোমাকে ঠকাতে চাই না। জানি নববর্ষের দিন তুমি লাল শাড়ি নিয়ে আসবে এবং আমাকে বিয়ে করতে চাইবে। তাই তুমি আসার আগেই তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেলাম। এবং তা চিরজীবনের জন্য। আমি যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমার যোগ্য নয়। তবুও বলছি, যদি পারো আমাকে ক্ষমা করে দিও। চাই না, আমার মতো সামান্য একটা মেয়ের জন্য তোমার সুন্দর জীবনটা নষ্ট হোক। দোয়া করি তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। আমার চেয়ে ভালো কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হও।

ইতি

কলঙ্কিনী আমি।

চিঠিটা পড়া শেষে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। গ্যাসের চুলায় আগুন জ্বলছিল। হাতে থাকা শাড়ির প্যাকেটটি চুলায় ধরলাম। কেউ বাধা দিল না। বাবার কাছে মিথ্যা বলে টাকা নিয়ে কেনা লাল শাড়িটি আরো লাল হয়ে আগুনে জ্বলতে লাগলো পুড়ে গেল শাড়িটি। কিন্তু আমার হৃদয়ের আগুন আজো বিদ্যমান।

সেদিন দুফোটা চোখের জল ফেলে চলে আসি। সেদিন আমার ভালোবাসার কোনো মূল্য ছিল না। কারণ আমি ছিলাম বেকার। টাকার কাছে পরাজিত হয়েছিলাম। সেদিন থেকে লাল শাড়ি আমার চিরশত্রু। আজ আমি সরকারি চাকরিজীবী। টাকাও আছে। বিয়ে করেছি। তবে বৌকে লাল শাড়ি কিনে দিইনি। বাসর রাতে বৌকে আমার লাল শাড়ির সমাচার বলেছিলাম। সেও আজ পর্যন্ত কোনোদিন লাল শাড়ি কেনার কথা বলেনি।

এ ঘটনা আজ থেকে সাত বছর আগের। সুমনা সেই যে গেছে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা হয়নি। জানা হয়নি সে কেন আমার লাল শাড়ি গ্রহণ করেনি।

কাউরিয়াপাড়া, নরসিংদী থেকে

দশ বছর পরে

– মামুন

দারিদ্রের কষাঘাতে বাল্যকাল থেকে অতোটা হয়তো জর্জরিত হতে হয়নি। তবে সচ্ছলতা নামে রহস্যময় জিনিসটার সঙ্গে কোনো কালেই আমার পরিচয় ছিল না। পরিবারে মানুষ ছিলাম আমরা মোট পাচজন। বাবা, মা, আমি আর আমার ছোট দুটি বোন। নিম্ন চাকরিজীবী বাবার স্বল্প আয়ের জন্যে বাবা মাকে খুব হিসাব করে সংসার চালাতে হতো। আমারা ভাইবোনেরা ছোটবেলা থেকেই পরিবারের এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম। সব সময়ই চেষ্টা করতাম আমাদের অন্যায়

আবদারের কারণে কখনো যেন বাবা মাকে অস্বস্তিতে পড়তে না হয়। তবে সংসারের এ টানাটানির ফলে কি না কে জানে, আমাদের মধ্যকার আত্মিক বন্ধনটা খুব দৃঢ় ছিল।

ভাইবোনদের মধ্যে মা আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আদার করে *বাবুন সোনা* বলে ডাকতেন। সীমিত সামর্থের মধ্যেও বাবা মা সব সময় সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন আমাদের সব ইচ্ছা পূরণ করতে। অতোটা দামি না হলেও আমাদের জন্য প্রতি ঈদেই নতুন জামা–কাপড় আর মায়ের জন্য নতুন শাড়ি আসতো। যখন আমাদের হাতে নতুন জামা–কাপড় তুলে দিতেন তখন আমার গরিব বাবার মুখে অনাবিল আনন্দ তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠতো। এরপর মাকে ডেকে নিয়ে তুলে দিতেন শাড়িটি। হয়তো অতোটা দামি শাড়ি নয়, কিন্তু সেই শাড়িতে মিশে থাকতো মায়ের প্রতি বাবার অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমরা কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখিনি।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় হঠাৎ আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ডাক্তার হাসপাতালে ছুটোছুটি করে বাবার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। কয়েকদিন পরেই ছিল ঈদ। ঈদের দুই দিন আগে বাবা সবার জন্য নতুন জামা–কাপড় কিনে আনলেন। আমাদেরকে দেয়ার পর বাবা কেমন যেন অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালেন। মা এসে বাবার হাত ধরে বললেন, তুমি একটা পাগল, এতোটা মন খারাপ করার কি আছে?

বাবা চলে গেলে মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, বাবা তোমার জন্য শাড়ি আনেনি?

আমাকে জড়িয়ে ধরে মা বললেন, আমার বাবুন সোনা যখন বড় হবে তখন আমার জন্য সুন্দর দেখে শাড়ি কিনে আনবে। আমি চুপ করে রইলেও আমার প্রতি মায়ের অকৃত্রিম বিশ্বাস উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, নিশ্চয়ই একদিন আমি মায়ের জন্য সুন্দর শাড়ি কিনে আনবো।

এরপর প্রায় দশ বছর পেরিয়ে গেছে। আমি ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে পড়ছি, আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা প্রায় একই রকম আছে। এরই মধ্যে ক্লাসমেট মাসুম আমাকে এক হাজার টাকার একটা টিউশনি জোগাড় করে দিল। আর্থিক দুঃসময়ে এই টিউশনিটা আমার কাছে রীতিমতো আশীর্বাদ বলে মনে হলো। যখন প্রথম মাসের বেতনের টাকা পেলাম তখন মনে পড়লো দশ বছর আগের সেই ঈদের কথা, আমার মায়ের কথা। সেদিনই মার্কেটে গিয়ে আটশ টাকা দিয়ে মায়ের জন্য সুন্দর দেখে একটা শাড়ি কিনে আনলাম।

বাসায় গিয়ে মায়ের হাতে প্যাকেটটা দেয়ার পর প্যাকেট খুলে মা প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন। পর মুহূর্তেই আমাকে জড়িয়ে ধরে অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়লেন যে কান্নার সঙ্গে মিশে ছিল শুধুই প্রাপ্তির আনন্দ। সবাইকে মা কান্নাভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমি বলেছিলাম না আমার বাবুন সোনা একদিন আমার জন্য সুন্দর দেখে শাড়ি নিয়ে আসবে। তোমরা দেখো, সবাই ভালো করে দেখো।

আমার মনে হলো এ জীবনে আর আমার কিছুই চাইবার নেই। মনে হলো আটশ টাকা দিয়ে মায়ের জন্য আমি শুধু একটা শাড়িই আনিনি, বরং এই সামান্য টাকায় দুনিয়ার সব আনন্দ, সব সুখ কিনে এনেছি।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

ফিরোজা কালার

– ফসিয়ার রহমান

সন–তারিখ স্পষ্ট মনে নেই। কোনো এক ঈদের সময়কার কথা। আমরা তখন নবদম্পতি। হাসি আনন্দেই কাটছিল জীবনের দিনগুলো। শ্বশুরবাড়ি থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমরা যেন সেখানে গিয়ে ঈদ করি। আমি তখন পেশায় একজন মুদি দোকানদার। মফস্বলে অবস্থিত সে দোকান থেকে যা আয় করতাম তাতে কোনো রকম দুজনের সংসার চলতো। এসেছে ঈদ, নিজের পোশাকের কথা মোটেও ভাবছি না। কেবলই মাথায় একটা চিন্তা কাজ করছে, কি করে স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ির ব্যবস্থা করা যায়? বন্ধু জাকিরকে সব খুলে বললাম। সে তখনো বিয়ে করেনি। বললো, তার এক ভাবীর শাড়ির ব্যবসা আছে। দুজনে মিলে গেলাম সেই ভাবীর কাছে। বেশ কয়েকটি শাড়ি ঘাটাঘাটি করে ফিরোজা কালারের একটা শাড়ি পছন্দ করলাম। দাম দুইশ ষাট টাকা। মনের মধ্যে তবুও একটা অস্বস্তি কাজ করছিল।

বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রী নাছরিনের হাতে ব্যাগটা দিলাম। সে তো রেগে আগুন।

বললো, তোমার জন্য কি এনেছো?

কিছু আনতে পারিনি। তার রাগের কারণ সেটাই। শর্ত দিলাম ঈদের আগে যেহেতু একদিন সময় আছে, আমার জন্য একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করবো। এবার সে শান্ত হলো। বললাম, শাড়ি তোমার পছন্দ হয়েছে?

হ্যা সূচক মাথা নাড়লো। বললো, খুব পছন্দ হয়েছে।

তারপর সে খুটিয়ে শাড়িটা উল্টে–পাল্টে দেখতে লাগলো। তার ঠোটে হাসির ঝিলিক। সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তুলনামূলকভাবে স্বামীর অবস্থা অসচ্ছল। তাই আমার চিন্তার কারণ ছিল এতো কম দামের শাড়ি সে পছন্দ করবে কিনা।

এখন আমি একজন গ্রামীণ ডাক্তার। আমার আজ কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। হয়তো আরোও একটু দামি শাড়ির আয়োজন সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সেদিনকার সেই স্মৃতি আমাকে আজো আবেগ আপ্লুত করে। শাড়ি পেয়ে তার খুশি দেখে আমারও চোখে পানি এসেছিল। *সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে* এ কথা সত্য হয়েছে আমার জীবনে। অল্পতে সন্তুষ্ট হতে জানে, ওই একটা গুণই আমাকে দেয় সুখের সন্ধান।

ঝিকরগাছা, যশোর থেকে

আগ্রাতে

– ইশরাত নাসরীন সোনিয়া

১৯৮৭–তে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পর ১৯৮৮–র এপ্রিলে স্বামীর সঙ্গে কলকাতা হয়ে দিল্লি, আগ্রা যাই হানিমুনে। আমাদের বিয়েটা ছিল পছন্দের। তাই ঠিক করেছিলাম বিয়ের পর মোগল সম্রাট শাহজাহানের অমর কীর্তি প্রিয়তমা মমতাজ মহলের সমাধি সৌধ বিখ্যাত তাজমহল দেখার। যাওয়ার সময় বিয়েতে স্বামীর দেয়া চমৎকার একটি ঢাকাই জামদানি সঙ্গে নিয়েছিলাম। দিল্লি, আগ্রার বিভিন্ন টুরিস্ট স্পটে ঘুরে বেড়ানোর সময় জামদানিটি পরেছিলাম এবং খেয়াল করলাম যে, ওখানে উপস্থিত প্রায় সব মহিলা আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। বুঝলাম সবই আমার পরনের শাড়িটির কারণে আমাকে দেখছে। শাড়িটি ছিল সত্যিই চমৎকার এবং বেশ দামি।

কলকাতায় এসে গেলাম বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম দেখতে। এক মহিলা অনেকক্ষণ যাবৎ আমাকে লক্ষ্য করছে দেখলাম। সেদিনও আমার পরনে ছিল সেই জামদানিটি। মহিলা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দিতে, আমার পরনের শাড়িটি কোথা থেকে কিনেছি, কতো দাম ইত্যাদি।

বললাম, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে। ইচ্ছা করেই দাম বলিনি।

মহিলা বললেন, ও তাই তো বলি, এতো দামি শাড়ি পরে কলকাতায় কেউ ঘুরতে বের হয় না আর তোমাকেও ঠিক ইনডিয়ান মনে হচ্ছে না।

মুচকি একটু হাসলাম। এবং মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম যে, আমাদের ঢাকাই জামদানি তাদের কাছে কতোটা লোভনীয়।

কলকাতা থেকে ফেরার আগের দিন গেলাম নিউ মার্কেটে কিছু কেনাকাটার জন্য। এক শাড়ির দোকানে একটি ফিরোজা কালারের চান্দেরি সিল্ক পছন্দ হলো। দোকানি শাড়ির দাম চাইলো ইনডিয়ান পাচশ রুপি। ইতিমধ্যে আমাদের কেনাকাটা শেষ। টাকাও হাতে কম ছিল। তো তিনশ রুপি পর্যন্ত বললাম। দোকানি সম্ভবত বুঝে গিয়েছিল আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তাই এক পয়সাও কমালো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে শাড়ি না নিয়েই হোটেলে ফিরলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেই শাড়িটি কিনতে না পারার দুঃখ আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল।

এরপর ১৯৯৬ সালে আবার কলকাতা যাই। তখন আমার স্বামী আমাকে প্রথমবার শাড়ি কিনতে না পারার দুঃখ ঘুচিয়েছিলেন এক সঙ্গে দশটি খুব দামি শাড়ি কিনে দিয়ে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

পরিবর্তন

– রিয়া

পর পর তিনটি কন্যা–সন্তান জন্ম হওয়ার পর আমার মা–বাবা দুজনেই চতুর্থ সন্তান ছেলে হবে এই আশায় বুক বেধেছিলেন। কিন্তু তাদের আশার গুড়ে বালি দিয়ে জন্ম হলো আমার। অর্থাৎ চতুর্থ সন্তানও হলো কন্যা সন্তান। বাবা–মা দুজনেই সামান্য একটু হতাশ হয়েছিলেন আমার জন্মের পর। কারণ আমার দাদা–দাদির একমাত্র সন্তান আমার বাবা। সেই সূত্রে আমার বাবার কোনো ছেলে

সন্তান না থাকলে তার এতো বিষয় সম্পত্তি কে রক্ষা করবে! এ ভাবনাটা আমাদের পরিবারের সবাইকেই খুব করে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা না চাইলে আদৌ কি কিছু সম্ভব?

অতঃপর আমার বাবা-মা ছেলে সন্তানের আশা বাদ দিলেন এবং আমার বাবা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্যই হয়তো আমাকে মেয়েদের ড্রেস না কিনে দিয়ে ছেলেদের ড্রেস কিনে দিতেন। সেলুনে নিয়ে ছেলেদের মতো করে চুল কাটিয়ে আনতেন। মেয়ে হয়েও আমি কোনোদিন অন্য দশটা সাধারণ মেয়ের মতো শৈশবে পুতুল খেলেনি, ছি-বুড়ি খেলিনি। খেলেছি ফুটবল, ব্যাডমিন্টন এসব। কারণ আমার বাবা আমাকে ছেলেদের খেলার সামগ্রীই বেশি কিনে দিতেন। যদিও আমার মা এটা খুব একটা পছন্দ করতেন না তবুও এভাবে পার করেছি জীবনের প্রথম তেরোটি বছর। সব সময় শার্ট-প্যান্ট পরে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় মেয়েদের ড্রেসের প্রতি পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।

আমি যখন ফ্রক, স্কার্ট, সালোয়ার-কামিজ পরার বিপক্ষে ঠিক সেই সময় আমার চোদ্দতম জন্মদিনে মা আমাকে উপহার দিলেন একটা চমৎকার রাজশাহী সিল্কের শাড়ি। শাড়িটা পেয়ে মন খারাপ করেছিলাম খুব। অভিমানে গাল ফুলিয়ে বসেছিলাম মা অন্য কিছু না দিয়ে শাড়ি দিয়েছিল বলে। আমার অভিমানী মুখটা দেখে মা আদর করে কপালে চুমু খেয়ে বলেছিলেন এটা তোকে পরিয়ে দিই, তারপর দেখ তোকে কতো সুন্দর লাগে।

কিন্তু আমি কিছুতেই শাড়ি পরবো না। অবশেষে মায়ের আদরের কাছে হার মেনে শাড়িটা পরে খুব সেজেগুজে যখন আয়নার সামনে দাড়িয়েছি তখন অবাক হয়ে দেখছিলাম নিজেকে। শাড়িতে মেয়েদের এতো চমৎকার লাগে! বিস্ময়ে চোখ বন্ধ করে নিজেকে নিয়ে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখছিলাম। মা আমাকে দেখে তখন আমার স্বপ্নটা আন্দাজ করতে পেরেছেন বুঝে সে সময় লজ্জায় মাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

সেই থেকে আমার ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করতো। তারপর থেকে প্রায়ই শাড়িটা পরতাম। শার্ট-প্যান্টগুলো ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বড়আপুদের সালোয়ার-কামিজ ধার করে পরতে শুরু করেছিলাম দেখে সবাই খুব অবাক হয়েছিল। আর মা খুব খুশি হয়েছিলেন আমার পরিবর্তন দেখে।

এর কিছুদিন পর এক শীতের সকালে হঠাৎ স্ট্রোকে মা মারা যান। মা মারা গেছেন আজ প্রায় এগারো বছর। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে, পুরনো হয়ে গেছে সব। কিন্তু আমার সেই শাড়িটা এখনো নতুন আছে। প্রায়ই ওটা বের করে নেড়ে-চেড়ে দেখি। ওটার ভেতর আমার মায়ের সেই আদর খুজি, স্পর্শ খুজি।

বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল থেকে

সাবালক

– মাসুদ পারভেজ

আজ থেকে আট বছর আগের কথা। আজো আমাকে তাড়না দেয়। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। বয়স হবে এগারো। আমার ছিল এক চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী অর্থাৎ আমার ভাবী। ভাইয়া একটা প্রাইভেট

ফার্মে চাকরি করতেন। প্রতি সপ্তাহে একবার বাড়ি আসতেন। ভাবী ছিলেন ভারী সুন্দর যার প্রশংসা সবাই করতেন। কিন্তু সুন্দরী হলে কি হবে, পর্দা ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না।

ভাবীর শ্বশুর–শাশুড়িরা পর্দা বা ইসলামি শরিয়তের ব্যাপারে খুবই কঠোর। ইসলামে যে বিধান আছে তাতে আমার পুরো বংশটিই ছিল এই ব্যাপারে সতর্ক। ভাবী আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। প্রায়ই ঘরে না থাকলে জিজ্ঞাসা করতেন আমি কোথায়। আমার চাচাতো বোনরা মজা করে বলতো, তোমার সঙ্গে তাকে বিয়ে পড়িয়ে দেবো। ভাবীর একটা সবুজ রঙের শাড়ি ছিল। যা ভাবীকে পরলে মডেল মৌকে হার মানাতো। মনে হতো ভাবী মৌ–এর চেয়েও সুন্দর পড়ালেখা ম্যাট্রিক পর্যন্ত। ভাবীকে প্রায়ই বলতাম, ভাবী, তোমাকে ওই শাড়িটা খুবই সুন্দর মানায়।

ভাবী ঠিক সেই শাড়িটাই পরতেন।

ভাবীকে দুষ্টুমি করে বলতাম, ভাবী, যদি আমার বিয়ের বয়স হতো তাহলে তোমাকেই বিয়ে করতাম। ভাবী বলতো, সত্যি? বিয়ে তো ভালোই বোঝো। আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা। এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী আমার লুঙ্গিটা খুলে ফেলেন।

হায়, কি লজ্জা!

ভাবী দৌড়ে চলে গেলেন।

একদিন ভাভীকে বললাম, যদি তোমার শাড়িটা ওইভাবে খুলে ফেলি তাহলে কেমন দেখাবে?

ভাবী বললেন, পারবি?

সত্যিই ভাবীর সঙ্গে পারতাম না।

ভাবী বলতেন, যে শাড়িটার তুমি প্রশংসা করো সেটাই তোমাকে পরাবো।

যেই কথা সেই কাজ। সুন্দর করে শাড়িটা পাঠিয়ে মেকআপ করিয়ে দিলেন, দুটো চুমু দিলেন। আমি অবাক! তারপর আমাকে দেখিয়ে সবাইকে হাসালেন।

কিন্তু হায়! সেই ভাবী আজ থেকেও নেই। আজ আমি অনেক দূরে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে। বাড়িতে গেলে আমার সঙ্গে ভাবী দেখা দেন না। মুখ ঢাকনা বা আড়ালে থেকে কথা বলেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, তুমি এখন সাবালক হয়েছো। তোমার সঙ্গে দেখা দেয়া যাবে না।

ইচ্ছা থাকলেও ভাবী পারেন না বাড়ির কঠোর নিয়মের কারণে।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

আদরীর জন্য

– বশিরুজ্জামান বশির

ধনী হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ১৯৯০ সালে ঝালকাঠি জেলার সরকারি শিশু সদন এতিমখানা থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে নিজ ইচ্ছায় বরিশাল থেকে *সাগর*–৬ নাম্বার লঞ্চে চড়ে ঢাকার বুকে পা রাখি। তারপর শুরু হয় কাজ খোজার এবং মাথা গোজার ঠাই। কিন্তু তিন বছরেও কোনোটির ব্যবস্থা করতে পারি না। ১৯৯৩ সালে মাথা গোজার ঠাই হয় আগারগাও বিএনপি

বস্তিতে। তারপর অনেক বছর যাবত টোকাই হিসেবে জীবন যাপন করি। রিকশার প্যাডলে পা রাখি। শুরু হয় কঠিন জীবন সংগ্রাম।

১৯৯৭ সালের ষোল এপ্রিল আছিয়া বেগম আদরী নামের একজন মেয়েকে একশ বিশ টাকা দামের একটি শাড়ি দিয়ে বধূ হিসেবে আমার ঘরে তুলি। তখনো পেশায় ছিলাম একজন রিকশাচালক। তাই এর চেয়ে বেশি দামের শাড়ি কেনা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

যদিও আশা ছিল। কিন্তু সাধ্য ছিল না। বিয়ের পর থেকে কখনো আমার স্ত্রীকে একটি ভালো শাড়ি পরাতে পারেনি। কেননা আমার অবস্থার পরিবর্তন হয়নি তাই। রিকশা চালিয়ে যা পেতাম তা দিয়ে খাওয়া–দাওয়াই খুব কষ্ট হতো।

আজ প্রায় সাত বছর যাবৎ আছিয়া বেগম আদরীকে নিয়ে ঘর করি। দুই ছেলের বাবাও হয়েছি। তবুও আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রীর শখ পূরণ করতে পারিনি। জানি না আমার স্ত্রীর শখ কখনো পূরণ করতে পারবো কি না। কেননা আছিয়া বেগম আদরী আমার ঘরে আসা মাত্রই একটি লাল টাঙ্গাইল শাড়ি কিনে দিতে বলেছিল। কথা দিয়েছিলাম কিনে দেবো। কিন্তু সাত বছরেও সেই শাড়ি কিনে দেয়া সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে ২০০০ সালে রিকশা চালানো বন্ধ করে ঢাকাতে চাকরির জন্য ঘুরছি। কিন্তু এখনো কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে ইচ্ছে আছে কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারলে আমার প্রথম বা দ্বিতীয় মাসের বেতনের টাকা দিয়ে আছিয়া বেগম আদরীর জন্য একটি শাড়ি কিনবো। তার সাত আট বছরের দাবি পূরণ করবো। জানি না, বিধাতা সে স্বপ্ন কবে পূরণ করবে।

জহুরী মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

জোড়া

– মোমিনুল ইসলাম মোমিন

আমার মামাতো বোন বীথির আজ গায়ে হলুদ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাসার ছাদ আত্মীয়স্বজনদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হবে। এখন চলছে আসন গ্রহণ পর্ব। আমি ও বীথির কয়েকজন বন্ধু স্টেজের পাশের চেয়ারগুলোতে বসলাম।

শীতের প্রকোপ কমে এলেও এখনো তা একদম ফুরিয়ে যায়নি। তারপরও আলোকসজ্জিত পরিবেশ এবং মানুষের উষ্ণতায় শীত লাগছে না, বরং গরম বোধ করছি। এমন সময় চোখ আটকে গেল একটি মেয়েকে দেখে। শাড়ি পরে একটি মেয়েকে যে এতো সুন্দর লাগতে পারে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। পাচ ফিট পাচ ইঞ্চির মতো লম্বা, ফর্শা মেয়েটিকে লালপেড়ে অফ হোয়াইট শাড়িতে চমৎকার লাগছে। শাড়ির ফাক দিয়ে হালকা মেদযুক্ত ফর্শা পেটের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এবং এতে তার সৌন্দর্য আরো একশগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি কাছে আসতেই চিনে ফেললাম। বীথির খালাতো বোন। বিকেলে একবার শুধু দেখেছি কিন্তু তখন তাকে এমন সুন্দর লাগেনি। শাড়িতেই তার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে মনে তার সঙ্গে পরিচিত হতে এবং কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। সেদিন তার সঙ্গে কোনো কথার সুযোগ

পেলাম না। অনুষ্ঠান শেষে বাসায় চলে এলাম। পরদিন বিয়ে। তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলা যায় তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। রাতে তাকে স্বপ্নে দেখলাম।

বীথিকে নিয়ে কমিউনিটি সেন্টারে পৌছে দেখলাম অতিথিরা প্রায় এসে গেছে। কিন্তু বরযাত্রী এখনো এসে পৌছায়নি। দেখলাম বীথির ছোট বোন সিমি ও ক্যামেলি (সেই মেয়েটি) অনেকগুলো রজনীগন্ধার স্টিক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। ব্যস্ত ভাব। মনে হচ্ছে বিয়ের সকল দায়িত্ব তাদের ওপর।

তাদের সামনে গিয়ে সিমিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এতো ফুল কি হবে সিমি?

সিমি কিছু বলার আগেই ক্যামেলি বললো, এই না হলে ভাই! আপনি কোনো কাজের না।

থতমত খেয়ে বললাম, মানে?

সে বললো, বরযাত্রী বরণ করার জন্য কতো কষ্ট করে ফুল নিয়ে এলাম। অথচ কেউ সাহায্য করার নেই।

বললাম, আমাকে কেউ তো কিছু বলেনি। এখন কি করতে হবে বলো?

বললো, বরযাত্রী এলে গেটে সাহায্য করবেন, কেমন!

আচ্ছা বলে চলে এলাম।

বরযাত্রী বরণ করার ফাকে আমাকে ভাইয়া বলে সে এটা-সেটা বললো। বুঝলাম আমার সম্পর্কে সে জেনে গেছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সিমির মাধ্যমে ফরমালি পরিচয় হলো। সে এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবে শহরের একটা কলেজ থেকে। থাকে সেই কলেজের হস্টেলে।

তারপর বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে তার সঙ্গে অনেক কথা হলো। তাদের কলেজে যাবার জন্য সে আমন্ত্রণ জানালো। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সপ্তাহ খানেক পর তাদের কলেজে গেলাম। অনেক ঘুরে তাকে না পেয়ে চলে আসছি এমন সময় বোরখা পরিহিতা একজন মেয়ে সামনে এসে বললো, মোমিন ভাইয়া, আপনি? আমি ইতস্তত বোধ করছি দেখে বললো, আমি ক্যামেলি। মুখ ঢাকা, এজন্য চিনতে পারেননি, তাই না?

বললাম, ঠিক তাই! তুমি যে কলেজে বোরখা পরো তা বলোনি তো?

সে যাই হোক। কেমন আছেন? ইউনিভার্সিটি যাননি? বললো ক্যামেলি।

বললাম, আজ ইউনিভার্সিটি যাইনি। আর আছি মোটামুটি।

ভালো নয় কেন?

তাতো জানি না। অনেক কথার ফাকে পরদিন তার সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়ে নিলাম। সে সহজেই রাজি হয়ে গেল।

পরদিন দেখা করে ফেরার সময় তার হাতে একটা চিরকুট গুজে দিলাম। তাতে লেখা ছিল –

সেদিন বিয়েতে তোমাকে শাড়িতে অপরূপা লাগছিল। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সমস্ত শাড়ি শুধু তোমার জন্য। শাড়ি পরিহিত তোমাকে আবার দেখতে ইচ্ছা করছে। আমার ইচ্ছার গুরুত্ব তোমার কাছে কতোটুকু তা অবশ্য এখনো জানি না।

চিরকুট পড়ার পর তার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হলো কি না বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম যে অসন্তুষ্ট হয়নি। আর কিছু না বলে পাশাপাশি হাটতে লাগলাম।

হস্টেলের সামনে এসে বললো, আগামীকাল আসতে পারবেন?

বললাম, কয়টায়?

দশটায়।

ঠিক আছে বলে বিদায় নিলাম। পরদিন দশটায় সে হস্টেল থেকে বেরিয়ে এলো। হালকা আকাশী রঙের শাড়িতে তাকে সত্যি অপরূপা লাগছিল। নিজেকে এতো সুখী লাগছিল যেন মনে হচ্ছিল আমরা রিকশায় নয়, বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। সারাদিন আমরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। দুপুরে এক সঙ্গে খেলাম। দিনটা স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

শেষ বিকেলের দিকে তাকে হস্টেলে পৌছে দেয়ার উদ্দেশ রিকশায় বসলাম। কিছুদূর যাবার পর ঘটলো বিপত্তি। হঠাৎ সে চিৎকার দিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি রিকশা থামাতে বললাম। তাকিয়ে দেখি তার শরীরের বামদিকের অংশে কাপড় নেই। শুধু ব্লাউজ আর ফর্শা কোমল পেট সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেছে। রিকশায় চাকায় তার শাড়ির আচল জড়িয়ে এমন কাণ্ড ঘটেছে। শাড়ি সহজে বের হচ্ছে না। শাড়ি ধরে জোরে টানলে ছিড়ে যেতে পারে তাই রিকশাকে পেছনে সরিয়ে এনে শাড়ির আচলটা কোনোমতে বের কলাম। তারপরও শাড়িটা পুরোপুরি রক্ষা করা গেল না। কিছুটা ছিড়ে গেল। সারাদিনের আনন্দ মাটি হয়ে গেল।

সেদিন শাড়িটা ছিড়ে গেলেও আমাদের দুজনের মন ঠিকই জোড়া লেগেছিল।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

স্পর্শ

– মেঘবতী

ছয় সেপ্টেম্বর ২০০১ সাল। সন্ধ্যা ছয়টায় তার ফোন এলো। তার ফোন পেয়ে খুব অবাক হলাম এবং তারচেয়েও বেশি অবাক হলাম যখন সে বললো, মেঘবতী, আমি তোমার শহরে। জানি না এরপর কোন অদৃশ্য পাখায় ভর করে ছুটে গিয়েছিলাম তার কাছে। দরজায় নক করার পর যাকে দেখলাম তাকে চিনতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হলো না। মনে হলো হাজার বছরের চেনা মানুষ সে। কারণ সে ছিল আমার স্বপ্নের মানুষ এবং সত্যিকার জীবনের রাজকুমার।

এরপর অনেক কথা ও ঘোরাঘুরির পর সে আমাকে পছন্দ করে একটা শাড়ি কিনে দিল। রঙ ছিল নীল এবং সবুজের মাঝামাঝি। শাড়িটা দেখে ভাবছিলাম আমার গায়ের কালো রঙয়ের সঙ্গে মানাবে কি না। অবশ্য এটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার। কারণ তাতে আমার ভালোবাসার স্বার্থ রয়েছে।

আমাদের শেষ দেখা হয় বারো সেপ্টেম্বর। সেদিন তার দেয়া শাড়িটা পরেছিলাম। জানি না তার কাছে কেমন লেগেছিল। কিন্তু আমি যা করলাম তা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। জীবনে কখনো মুখ ফুটে কারো

কাছে কিছু চাইনি। ইচ্ছেও করেনি কিন্তু সেদিন তাকে সারা জীবনের জন্য পেতে চাইলাম। সে বিধাতার দোহাই দিল। সেদিনের তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি স্বার্থ চোখ বন্ধ করলেই অনুভব করতে পারি। সেদিন যখন আমাদের বিচ্ছেদ হলো তখন সূর্য ডুবে গেছে। প্রকৃতিতে চলছে সন্ধ্যার এক অদ্ভুত আলো আধারের খেলা। না, আমি তখন কাদিনি। তবে আমার পুরো ভবিষৎটা তখন হাহাকার করে উঠেছিল যখন মনে হলো এই বুঝি জীবনের শেষ দেখা।

পনেরো বছর বয়স থেকে যার জন্য অপেক্ষা করছি সেই মানুষটাকে আজকাল বড় অচেনা মনে হয়। দুই মাস আগেই তার রেজাল্ট দিয়েছে, মাস্টার্সে সে খুবই ভালো রেজাল্ট করছে। আমি জানি সে আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। তবুও সে আমাকে ভালোবাসে না এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে, বিশ্বাস করতে পারি না। আমার প্রতিটা মুহূর্তে তার অপেক্ষায় কাটে। এখন কোনো বিশেষ দিন এলেই তার দেয়া শাড়িটা পরি আর ভাবতে থাকি, সে আমার খুব কাছেই রয়েছে। ইচ্ছা করলেই তাকে স্পর্শ করতে পারি।

চট্টগ্রাম থেকে

পায়খানার দোকানদার

– মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান রতন

অনামিকাকে প্রথম দেখেছিলাম একত্রিশ ডিসেম্বর ১৯৯৩–এ। বাংলাদেশ ডিবেটিং সোসাইটির পিকনিকে। স্থান বনবিলাস, খুলনা। তার সঙ্গে পরিচয়টা ছিল একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সেদিন তার পরনে ছিল শাড়ি। বুঝতে পারিনি বিবাহিতা কি না। তাই প্রথম কথা ছিল তুমি কি বিবাহিত? তারপর থেকেই বন্ধুত্ব ও সখ্যতা। এভাবেই কেটে গেছে অনেকগুলো বছর।

২০০০ সাল। তখন সে কেয়ার আন্তর্জাতিক সংস্থার বাগেরহাট ইউনিটের টেকনিকাল অফিসার। আর আমি বাবার অবসর গ্রহণের পর ছোট একটি স্যানিটারি শপ খুলেছি। পরিচিতজনদের কেউ পেশার কথা জানতে চাইলে রসিকতা করে বলি, *পায়খানার দোকানদার।* সে বছর আমি সুন্দরবন রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের সচিব আর সে মেম্বার। সেই সম্পর্ককে পুজি করেই ক্লাব এবং তার বাইরে এক সঙ্গে চলাটা আমাদের অলিখিত রুটিনে পরিণত হয়ে গেছে।

মার্চের শেষ সপ্তাহ। খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে চলছে বাণিজ্য মেলা। দুজনে এক সঙ্গে গেছি সেখানে। সবুজ রঙয়ের শাড়িতে সেদিন তাকে অপূর্ব লাগছিল। এক পর্যায়ে এক স্টেশনারি স্টলের সেলসম্যান শাড়ি পরিহিতা অনামিকাকে ভাবী এবং আমাকে ভাই ডেকে তার পণ্য সামগ্রী দেখাতে লাগলো। তখনকার তার লাজে রাঙা চেহারাটা সত্যিই দেখার মতো ছিল। আমিও বেশ পুলকিত বোধ করছিলাম। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারিনি। কারণ লজ্জা আমিও পেয়েছি। দুজনেই নীরবে মেলা পরিদর্শন শেষ করেছি সেদিন। সত্যিই তো! সেই ১৯৯৩ সাল থেকে আমাদের বন্ধুত্ব, একে অপরকে চিনি, জানি, বিশ্বাস করি। যদি এই অনুভূতিটাকে আর একটু গভীর করে এক ছাদের নিচে নেয়া যায় মন্দ কি? কিন্তু সে কথা তাকে বলতে পারছিলাম না। সে কেয়ার–এর মতো সংস্থায় ভালো চাকরি করে

মোটা অংকের সেলারি পায়। সে তেমন কাউকে বিয়ে না করে আমার মতো পায়খানার দোকানদারের সঙ্গে জড়াবে তা ভাবতেও পারি না। কথাটা মুখে বলার মতো অবস্থা ছিল না। তাই লিখলাম,

অনামিকা,

...জানি, আমার সম্পর্কে তোমার বেশ ভালো একটা ধারণা আছে। তবুও কেবল এটুকু দাবিকে সামনে রেখে তোমার কাছে আসতে চাওয়াটা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তারপরও অবুঝের মতো তোমার হৃদয়ের পদ্মাসনটি অধিকার করতে খুব ইচ্ছা করে। ভাবতে পারো এটা আমার ঔদ্ধত্য হতে পারে কিন্তু মিথ্যা নয়...।

মাত্র এটুকুতেই তার সাড়া পেয়েছিলাম আশাতীত ভাবে। তারপর থেকেই পেতে শুরু করলাম পাতার পর পাতা চিঠি। তাতে লেখা ডজন ডজন অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি আর কথার মালা। এভাবেই চলছিল। মাত্র কয়েক মাসেই আমরা আমাদের সব সিদ্ধান্ত পাকা করে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। ভবিষ্যতের দিনগুলো নিয়ে রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছি। কিভাবে বিয়ে হবে, কিভাবে বাসর সাজানো হবে, বিয়ের পোশাক হিসেবে কে কি পরবো। সব কিছু কোন কমিউনিটি সেন্টারে সমাধা হবে তাও প্রায় চূড়ান্ত।

ডিসেম্বর মাস, ঈদুল ফিতর আসন্ন। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাকে কিনে দিলাম নীল রঙয়ের একটি *প্রাইড* শাড়ি। তারপর কয়েকদিন দেখা নেই। হঠাৎ একদিন তার চিঠি পেলাম। তাতে লেখা,

...শাড়ি কিনলে দেখে কিনতে হয় এই অভিজ্ঞতার ট্রেনিংটি আমার কাছ থেকে নিও। দাম নিয়ে আর কখনো কিছু বলবে না। তুমি দিয়েছো এই বড়, এ অনেক আনন্দের দাম কোনো বিষয় নয়। তাছাড়া তোমার অবস্থা তো আমি খুব ভালো জানি। তবে আমার খারাপ লেগেছে এটি রাখতে পারিনি বলে। একবার ভেবেছিলাম রেখে দিই। সারা জীবন বলা যাবে, 'জীবনের প্রথম ছেড়া শাড়ি' চিন্তাটা স্থায়ী করতে ভালো লাগেনি...।

সত্যিই শাড়িটা যে ছেড়া ছিল তা বুঝতে পারিনি। তবে ভালো লেগেছে সেই সেটি শো-রুম থেকে বদল করে হালকা সবুজ রঙয়ের একটি এনেছে। সে ঈদেই গিফট হিসেবে সে আমাকে দিয়েছিল হাতের কাজ করা একটি শাদা পাঞ্জাবি। এমনিভাবে হাসি, আনন্দ আর স্বপ্নের মাঝে গড়িয়ে গেছে আরো একটি বছর। এর মধ্যে আমরা আরো এগিয়ে গেছি আমাদের ভালোবাসার শেষ গন্তব্যের দিকে। বিষয়টা আমার পরিবার থেকে চূড়ান্ত। তার বক্তব্য অনুযায়ী তার পরিবার থেকেও কোনো বাধা ছিল না।

পচিশ অক্টোবর ২০০১। তার মুখ থেকেই জানলাম যে, সে *সেভ দি চিলড্রেন* সংস্থায় চাকরি পেয়েছে। শুনে তার সঙ্গে আমি আনন্দিত হলাম। পরদিন ছাব্বিশ অক্টোবর ২০০১-এ তার মুখ থেকেই প্রথম শুনলাম তার বাসার কেউ-ই আমাকে পছন্দ করছে না। তবুও সে নিজে থেকেই আমাকে তার প্রতি শতভাগ আস্থাশীল থাকতে বললো। সেদিনই জানলাম উত্তর বাংলায় তার কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ এক নভেম্বর ২০০১-এ। একত্রিশ অক্টোবর রাতেই সে যাত্রা করবে কর্মস্থলের

উদ্দেশে। তার ইচ্ছাতেই আমরা সেদিন অনেক সময় রিকশায় ঘুরেছি। ঈদ আসতে আর বেশি দেরি নেই। তাই তার চাকরি ও ঈদ দুই খুশি উপলক্ষে ওই দিনই তাকে আরো একটি শাড়ি কিনে দিতে চাইলে সে নিতে চায়নি। বলেছে, ঈদ আসতে আসতে পুরনো হয়ে যাবে। বললাম, এখন টাকা আছে ঈদের সময় তেমন সুযোগ নাও হতে পারে। সে বললো, তাহলে যেন তাকে শাড়ির মূল্য বাবদ টাকাটা দিয়ে রাখি। ঈদের সময় দুইজন এক সঙ্গে *প্রাইড* শো-রুমে গিয়ে কেনা যাবে। তার কথাটা ফেলতে পারিনি। পকেট থেকে কড়কড়ে তিনটি একশ টাকার নোট বের করে তার হাতে দিলাম, কথা হলো ঈদের ছুটিতে সে এলে দুজনে এক সঙ্গে গিয়ে শাড়ি কিনবো।

রাতেই সে চলে গেল। যাবার আগে তাকে বেশ কয়েক পৃষ্ঠার চিঠি দিলাম। তাতেই প্রথম জানালাম যে আমার মা তার জন্য আংটি কিনেছে।

তারপর প্রতি সপ্তাহেই তাকে চিঠি লিখেছি তবে কোনো উত্তর পাইনি। মোবাইলে কথা বলেছি সেও বলেছে দায়সারাভাবে। ঈদের পাচ দিন আগে সে ছুটিতে এসেছে ঠিকই। কিন্তু আমার সঙ্গে একটি দিন দেখা করেনি। এমনকি টেলিফোন পর্যন্ত নয়। শপিং-এও সে গিয়েছে কয়েকবার করে। তবে আমার সঙ্গে নয়। আমারই মতো অন্য একজনের সঙ্গে এবং রোমান্টিকভাবেই। তার সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছে পচিশ ফেব্রুয়ারি ২০০২-এ। সেদিন আমার প্রতি তার উদাসীনতার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিয়েছিল, আমি সেভ দি চিলড্রেন-এ কাজ করি। স্যালারি প্রতি মাসে ত্রিশ হাজার টাকা। তুমি কি করে ভাবলে যে, তোমার মতো পায়খানার দোকানদারের হাতে আমার বাপ-ভাই আমাকে তুলে দেবেন?

সত্যিই তো! কি করে ভাবি? শাড়িটি কিনেছে কি না তা আর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। যে মেয়ে মাসে ত্রিশ হাজার টাকা স্যালারি পায় তাকে মাত্র তিনশ টাকার শাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করাটা রীতিমতো অন্যায়। জেনে বুঝে এমন অন্যায় কি করে করি? তবে কি ঈদুল আজহার দিন যে শাড়ি পরে তাকে বানরগাতির রাস্তায় দেখেছি সেটা কি আমার টাকায় কেনা? খুব জানতে ইচ্ছা করে।

খালিশপুর, খুলনা থেকে

ছেরী হইবার চায়

– ফারহানা ফেরদৌসী

শাড়ি আমার শখের পোশাক। তবে ঘরে সব সময় পরতে ভালো লাগে না। কারণ রান্না-বান্না, বাচ্চা দেখাশোনা শাড়ি পরে করতে গেলে কষ্টকর মনে হয়।

আমার শ্বশুরবাড়ি গেলে সব সময় শাড়ি পরে থাকতে হয়। কারণ সে বাড়িতে আপা-বাচ্চা থেকে শুরু করে শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই শাড়ি পরা খুব পছন্দ করেন। এ জন্য কষ্ট হলেও সব সময় শাড়ি পরে থাকতে হয়। তখন শাড়িটা শখের বদলে কষ্টের কারণ হয়।

একদিনের ঘটনা। শ্বশুরবাড়ি থেকে রওনা হচ্ছি নিজের বাসায় আসার জন্য। জার্নিতে সালোয়ার কামিজ পরি। সালোয়ার কামিজ পরে তৈরি হয়েছি এমন সময় পাশের বাসার ভাবী এসেছেন দেখা করতে। আমাকে সালোয়ার কামিজ পরা দেখে বললেন, *ওমা! বৌ দেহি ছেরী হইবার চায়।*
তার ধারণা বিয়ে হলে শাড়ি পরা ছাড়া অন্য পোশাক পরা যায় না। আর যেহেতু আমি বিবাহিতা, আমাকে অবশ্যই অঙ্গে শাড়ি ধারণ করতে হবে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মহাখালী, ঢাকা থেকে

দুঃসহ

– শ্রীকান্ত

পাশাপাশি থাকার কারণে এক মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার চঞ্চলতা, স্পষ্ট কথা বলা, শারীরিক গঠন, বিশেষ করে পিঠ ভর্তি এক রাশ লম্বা কালো চুলের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করতো। ধীরে ধীরে এমন এক সময় চলে এলো যে, তাকে একদিন না দেখলে, তার কথা না শুনলে স্থির থাকতে পারতাম না। সে যেদিন বাড়িতে থাকে না সেদিন বাড়ি না আসা পর্যন্ত কি যে এক শূন্যতা সমস্ত মনকে গ্রাস করতো! যখন সে বাড়িতে আসতো তখন তাকে এক নজর দেখার জন্য, তার কথা শোনার জন্য চোখ–কান সজাগ করে রাখতাম।
ক্রমেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। নিজেকে শত চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। মেয়েটিও যে আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে তা তার একদিনের আচরণে বুঝতে পারলাম। আমাদের এই সম্পর্কটা পরিবারের কেউ মেনে নেবে না জেনেও মেয়েটির ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দিই এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকি।
আমাদের সম্পর্কটা পাকাপোক্ত হওয়ার কিছুদিন পর তার বয়সের দ্বিগুণ বয়সী এক পরিচিত ভদ্রলোক তাদের বাসায় আসেন। সেদিন দেখি, সন্ধ্যাবেলায় এদের বারান্দায় আমার সেই প্রিয়জন এবং সেই ভদ্রলোক অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছে। তার সঙ্গে লোকটিকে এভাবে বসে থাকতে দেখে আমার মাথায় খুন চেপে যায়। নিজেকে খুব কষ্টে নিয়ন্ত্রণ করে সেদিন রাতে অন্য এক সময়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটির সঙ্গে এভাবে বসে ছিলে কেন?
একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো এবং আমাকে তিরস্কার করে বললো, তুমি তার সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করছো কেন?
হতবাক হয়ে গেলাম তার সঙ্গে ওই লোকের আপত্তিকর কোনো সম্পর্ক নেই শুনে। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে বললাম, আমার ভুল হয়েছে, ওনার সম্পর্কে আর কখনো এ ধরনের কথা বলবো না।
কিন্তু মনের মধ্য থেকে তাদের সেদিন অন্ধকারে বসে থাকার দৃশ্য কোনোভাবেই মুছে ফেলতে পারছি না। বার বার মনে প্রশ্ন জাগে! দ্বিগুণ বয়সী লোকের সঙ্গে তার কি এমন কথা যে, অন্ধকারে বসে বলতে হবে।

এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে যায়। এর মাঝে আমাকে সে বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো গিফট কিনে দিয়েছে। আগের ঘটনা ধীর ধীরে মন থেকে মুছে যেতে থাকে। আমিও নতুন উদ্যমে তার সঙ্গে মিশতে থাকি। দিনগুলো স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছিল।

পহেলা বৈশাখ ১৪০৯–এর কয়েকদিন আগে তাকে বললাম, চলো নববর্ষের দিন বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসি।

সে বললো, বাইরে গেলে আমাদের দুজনকে পরিচিত কেউ দেখে ফেললে পরে সমস্যা হবে। তার চেয়ে বাড়িতেই আমরা নববর্ষ মজা করে পালন করবো।

তার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। এবং বাইরে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিলাম। মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি নববর্ষ কিভাবে পালন করা যায়। আমি যখন পহেলা বৈশাখ ১৪০৯–কে জীবনে স্মরণীয় রাখতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে ওই ভদ্রলোক আমার মনের আকাশে কালো মেঘের বেশে উড়ে এসে আগামী দিনের নববর্ষকে বরণ করতে যে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম তা মুহূর্তেই তছনছ করে দিল। অর্থাৎ নববর্ষের ঠিক আগের দিন বিকেলে ওই ভদ্রলোক তাদের বাড়িতে এলো। তাকে দেখার পর থেকে মনের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হলো এবং কোনোভাবেই নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কেন এসেছে?

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বললো, জানি না।

অনেক চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কি জন্য লোকটি আসে, তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক এসব বিভিন্ন চিন্তায় সেই রাতে কোনোভাবেই ঘুমাতে পারলাম না।

পহেলা বৈশাখ ১৪০৯–এ সকাল দশটার দিকে তার সঙ্গে দেখা। পরনে দামি লাল পৃন্টের শাড়ি, কপালে লাল টিপ, পিঠ ভর্তি খোলা চুল, হাতে লাল কাচের চুড়ি এবং পায়ে নূপুর পরা অবস্থায় তাকে অপূর্ব লাগছিল। কোনোভাবেই চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। বললাম, শুভ নববর্ষ।

সেও আমার কথায় উত্তর দিল।

এদের বাড়ির একজন লোক আমাদের দুজনার সম্পর্কের কথা জানতো। যে কোনো সংবাদ তার মাধ্যমেই দেয়া নেয়া হয়। সেই লোকটি ঘণ্টা দুয়েক পরে এসে আমাকে জানালো, আমার প্রিয়জনের পরনের শাড়িটি ওই ভদ্রলোকের নববর্ষ উপলক্ষে গিফট দেয়া। এর আগে এরা যখন অন্য জায়গায় ছিল তখন থেকে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার প্রিয়জনের পরিচয় আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, তখন থেকে এদের দুজনার মাঝে একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

এ কথা শোনার পর আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছিল। সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে এলো। চুল পরিমাণ নড়াচড়া করার শক্তি মনে হলো শরীরে নেই। মনে হলো অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি।

এভাবে কতোক্ষণ কেটে গেল বুঝতে পারিনি। সংবিৎ ফিরে পাওয়ার পর অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। নিজেকে এতোটা ছোট কোনোদিন মনে হয়নি।

শুধু শাড়ি গিফট দেয়ার জন্য দ্বিগুণ বয়সী বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সে যে বিছানায় গেছে এ কথা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছি না। সে কি সত্যি ওই লোকটিকে ভালোবাসে! তাহলে আমাকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখালো কেন? হাজার টাকার শাড়ি গিফট দেয়ার সামর্থ নেই বলেই ভালোবাসার নামে আমাকে নিয়ে ইচ্ছে মতো খেললো! যখন প্রয়োজন হতো তখন কি ছুড়ে ফেলে দিতো? এ রকম নানান প্রশ্ন আমাকে জর্জরিত করছে। পহেলা বৈশাখের পর থেকে নিজেকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কারো সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলার ইচ্ছা হয় না। কোনো কাজে মন বসে না। কি যে এক দুঃসহ জীবন অতিবাহিত করছি তা বোঝাতে পারবো না।

রংপুর থেকে

মা

– প্রদীপ চাকমা

১৯৯২ সাল। পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দেই। আমরা তিন বন্ধু কলেজের পেছনের একটা বাড়িতে ভাড়া থেকে পরীক্ষা দিই। পরীক্ষা শেষে আমার এক বন্ধু আমাকে নিয়ে মার্কেটে যায় তার মায়ের জন্য একটি শাড়ি কিনতে। শাড়ি কিনে যখন বাসায় আসি তখন আমার মাথায় একটা হঠাৎ বুদ্ধি চাপলো। আমিও আমার মায়ের জন্য একটি শাড়ি কিনে তাকে একটা সারপ্রাইজ দিলে কেমন হয়।

যেই চিন্তা সেই কাজ। মায়ের জন্য একটা টাঙ্গাইলের সূতি শাড়ি কিনে নিয়ে পরীক্ষা শেষে বাড়িতে আসি। জীবনে কখনো শাড়ি কিনিনি এবং এ ব্যাপারে তেমন কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। দুপুরে খাওয়ার পরে মাকে আড়ালে ডেকে বললাম, তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, বলো তো কি?

মা বললেন, তুই খুলে না বললে বুঝবো কি করে?

শাড়ির প্যাকেটটা মায়ের হাতে দিয়ে বললাম, মা, তোমার জন্য।

প্যাকেটটা খুলে আমার মা বললেন, রোকন, তুই আমার জন্য শাড়ি এনেছিস?

আমার মায়ের চোখ দুটো ছলছল করছিল, তিনি আমার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

এরপর পরীক্ষার রেজাল্ট বের হতে অনেক সময়। তাই ভাবলাম দুই একটা টিউশনি করি। টিউশনি করিয়ে যে টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে মাকে আর একটি শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম এবং সেটাই ছিল মাকে দেয়া আমার শেষ শাড়ি।

১৯৯৭ সালে ইটালি হয়ে ফ্রান্সে আসি। আমার এখানে স্থায়ীভাবে থাকার একটা ব্যবস্থা আমার হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আসে অর্থনৈতিক মুক্তি। অনেক স্বপ্ন দেখি মাকে দেশে গিয়ে এক সঙ্গে অনেকগুলো শাড়ি কিনে দেবো। কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর নিয়তি। ওই বছরই মা আমাদের চার ভাই, এক বোনকে ছেড়ে চলে গেছেন পরপারে। আর কোনোদিন মাকে শাড়ি কিনে দিতে পারবো না। আজো এই সুদূর ফ্রান্সে বসে মাকে দেয়া প্রথম শাড়িটার কথা মনে পড়লে চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে।

প্যারিস থেকে

আমার হৃদয়খানিতে

সব বাঙালি মেয়ের কাছেই শাড়ি একটি অন্যতম প্রিয় পোশাক। আর আমার কাছে? কি বলবো, মনে হয় শাড়ির কোনো বিকল্পই নেই। আমার কাছের আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ পরিচিত অনেকেরই জানা আছে শাড়ির প্রতি আমার অসম্ভব দুর্বলতার কথা। এবং যে কোনো অনুষ্ঠানে শাড়ি পরতে আমার কোনো জুড়ি নেই।

আমার উচ্চতা কম বলে অনেকের ধারণা ছিল, আমাকে শাড়ি পরলে তেমন ভালো দেখাবে না যতোটা ভালো দেখায় আমার অন্য বোনদের এবং অন্য মেয়েদের। আমার দুলাভাই একদিন বলেছিলেন, তোকে সালোয়ার কামিজেই ভালো লাগে, শাড়িতে ভালো লাগে না। তার কিছুদিন পর যখন সুন্দর করে একটা শাড়ি পরেছিলাম তখন দুলাভাই দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন আমি তো ভাবতেই পারিনি তোকে এতো সুন্দর দেখাবে শাড়ি পরে। সেদিন খুব ভালো লেগেছিল আমার। এখন সবাই বলে শাড়ি পরলে নাকি আমায় ভালো দেখায়।

আমি যাকে ভালোবাসি তার নাম সাদাত। সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হয় সে। একদিন অনেক শখ করে লাল পাড়, শাদা শাড়ি কিনলাম, কারণ কলেজের ফাংশনে লাল পাড়, শাদা শাড়ি পরতে বলা হয়েছিল। এবং শাড়িটা আশপাশের কারো কাছে চেয়েও পায়নি। তাই নিজেই কিনে ফেললাম। আমার ছোটবোন একদিন সাদাতকে বললো, ভাইয়া, জানেন, আপা একটা শাড়ি কিনেছে লাল পাড়, শাদা। ও বললো, কেন, তোমার আপু বিধবা নাকি যে শাদা শাড়ি কিনেছে? জানতাম আমাকে রাগানোর জন্য বলেছিল। তাই রাগ করিনি সেদিন।

সাদাত বাড়ি এলে নানান ছুতায় শাড়ি পরতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুজন দুজনার কাছে যেতে পারতাম না। আমাকে তার একান্ত করে পাওয়া হতো না। হয় সুযোগ মিলতো না কিংবা দুজনের মাঝে রাগ–অনুরাগের স্রোত বয়ে যেতো। ওকে বলেছিলাম, সাদাত, দেখো, বিয়ের আগেই একদিন শাড়ি পরে তোমার সঙ্গে ঘুরবো। ঠিক এমন একটি দিন আমাদের এসেছিল। শুধু শাড়ি পরে ঘোরাতেই একটি পরিবারের কাছে সেদিন সাদাতের সত্যিকারের বৌ হয়ে গিয়েছিলাম। সময়টা ছিল অক্টোবরের শেষ। আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। ২০০০ সাল। আমার এক বন্ধুকে নিয়ে সাদাতের সঙ্গে দেখা করতে যাই। উদ্দেশ্য ছিল, সাদাতের সঙ্গে দেখা করা এবং বন্ধুর কলেজে বেড়াতে যাওয়া। আমার বন্ধুটি অবশ্যই মেয়ে। আমার পোশাক ছিল শাড়ি। সেটা আমার বন্ধুরই। ওখানে গিয়ে শুনলাম ওদের এক বড়ভাইয়ের ম্যারেজ ডে–র অনুষ্ঠান। সেখানে সাদাতের বন্ধুরা সবাই আমাকে নিয়ে যেতে চায়। যেহেতু অনুষ্ঠান সন্ধ্যার পর ছিল সেহেতু বিকালটা বসে থেকে কাটানো যায় না। আমার এক চাচাতো ভাই, সাদাত এবং আমি তিনজনে এক আপার বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম রিকশায় চড়ে।

সেখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে যথাসময়ে ফিরে এলাম। সেখানে বন্ধুরা সবাই পরিচয় করিয়ে দিল এটা সাদাতের বৌ, আমাদের ভাবী। এমনিতেই সাদাতের বন্ধুরা আমার ভাবী ডেকে এটা আমার খুব ভালো লাগে। যদিও সব সময় না, মাঝে মধ্যে। যাই হোক। ওরা সবাই ভাবী তো ডাকছিলই, যে ভাবীর ম্যারেজ ডে-র অনুষ্ঠান তিনিও ভাবী ডাকা শুরু করলেন। ছোটরা কাকি বলে ডাকছিল। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। বিপাকে পড়লাম তখনই যখন ভাবী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাবী, আপনাদের কবে বিয়ে হলো? সাদাত ভাই তো আমাদের জানালো না।

আগেই সে নিষেধ করছিল যেন আমি কোনো উত্তর না দিই।

বললাম, সাদাতকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন আপনাদের জানালো না?

বিয়েবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটা প্রথম হলেও সেটা ছিল ঘরোয়াভাবে। বাইরের মানুষ বলতে আমরাই ছিলাম। কয়েকজন, অর্থাৎ আমিসহ সাদাতের কয়েকজন বন্ধু। তাই কেক কাটা শেষ হতে বেশি দেরি হলো না। অনুষ্ঠান শেষে সকলে মিলে আমাদের দুজনকে ঘরে রেখে চলে গেল ভেতরের দিকে। সাদাত তখন এক পা, দুই পা করে আমার দিকে এগিয়ে এলো। উহু, দরজাটা ভেতর থেকে লাগাতে ভোলেনি সে। এদিক দিয়ে সাদাত একজন দক্ষ খেলোয়াড়। আমার তো তখন লজ্জায় নড়ার মতো শক্তিটুকুও নেই। সাদাত কাছে এসে দুই হাত দিয়ে আমার মুখটি তুলে বললো, তুমি আমার সোনাবৌ, লক্ষ্মীবৌ।

যদিও সাদাত জানে আমি একদম লক্ষ্মী না। তারপর আমার ঠোট দুটো সাদাতের ঠোট দুটো দখল করে নিল। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রাখলাম। আমাকে সাদাত খাটে শুয়ে দিল আর তার হাত দুটো নেমে এলো আমার বুকের মাঝে। শাড়ি ছিড়ে যাবে ভেবে শাড়িতে আটকানো সেফটিপিন খুলে বুক থেকে আচল সরিয়ে একটা করে ব্লাউজের বোতাম খুলে ফেললো। তারপর ওর দুষ্টু হাত দুটো আমার বুকের মাঝে খেলা করতে গাললো। মাঝে মধ্যে ওর ঠোট দুটিও নেমে খেলা করছিল বুকে। এক সময় দরজায় টোকা পড়লো। আমি উঠে শাড়ি ঠিক করতে করতে বলি, একটু পরে খোলো না!

কেন?

বোতামগুলো লাগিয়ে নিই। কেন জানি না বোতামগুলো তাড়াতাড়ি লাগতে পারছিলাম না।

সাদাত বললো, সবগুলো লাগানোর দরকার কি? নিচেরটা খোলা থাক, বোঝা যাবে না তো। বলতে বলতেই দরজা হুট করে খুলে ফেললো।

আমি তখন শাড়ির ঠিক করে নিচ্ছিলাম। ওর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু যার সঙ্গে আমি ছেলেবেলা থেকেই পরিচিত ছিলাম সে ঘরের ভেতর চলেই এসেছিল। দরজা থেকে আমাকে ওভাবে দেখে আর ভেতর না ঢুকে চলে গেল বাইরে। কি অস্বস্তিকর অবস্থা তখন আমার। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। সাদাতের ওপরও রাগ হচ্ছিল খুব। আর এক মিনিট পর দরজাটা খুললে কি হতো? কিছুক্ষণ পর সাদাত ডাকার পর সবাই আবার ভেতর এলো। সেই অনুষ্ঠানেই আমরা দুজন প্রথম এক সঙ্গে ছবি তুলেছি। এটা

ভেবে আরো ভালো লাগে যে, আমাদের প্রথম ছবিতে আমার প্রিয় পোশাক শাড়ি পরে আমি ওর পাশে।

আমার ধারণা ছিল, সাদাত প্রথম আমার কোনো ড্রেস উপহার দিলে সেটা অবশ্যই হবে শাড়ি। কিন্তু নববর্ষে সাদাত সালোয়ার কামিজ উপহার দিয়েছে আমাকে। ভালো হয়েছে। কারণ ও জানতো শাড়ি কিনলে আমারই সমস্যা হতো বেশি। আমার এখনো বিয়ে হয়নি, কলেজে পড়ি। তাই কোনো ফাংশন ছাড়া সালোয়ার কামিজই সব সময় পরি। শাড়ি সবচেয়ে প্রিয় পোশাক হওয়া সত্ত্বেও পোশাকের তালিকায় শাড়ি মাত্র দুটি আর থ্রি-পিস অনেকগুলো। ভবিষ্যতে অবশ্যই এ বৈষম্যটা থাকবে না। বৈষম্যটা হবে বর্তমান থেকে ঠিক উল্টো।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, কুষ্টিয়া থেকে

দামি

– সিলভিয়া

খালাতো বোন বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আমাদের বাড়ি ছিল খালি। খালাতো বোনের বাড়িতেই আমি থাকি। আমি, দুলাভাই ও কাজের মেয়ে থাকতাম। বোন গেছে সকালে। দুলাভাই তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজেও অফিসে গেল না। বাসায় এসে বললেন, শরীরটা খারাপ লাগছে। তাই অফিসে যাবো না।

আমি বাসায় শাড়িই পরি।

কাজের বুয়া ছুটা কাজ করতো। দুপুরে কাজ শেষ করে চলে গেল। বাড়িতে তখন শুধু আমি আর দুলাভাই। তিনি খাওয়া-দাওয়া করে তার রুমে ঘুমাচ্ছেন। আমার রুমে আমি শুয়ে আছি। বেশ গরম। বুক ঘেমে ব্রা, ব্লাউজ ভিজে গেছে। শাড়ির আচল ফেলে ফ্যানের নিচে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। কখন যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

হঠাৎ শরীরের ওপর অন্য মানুষের ভার অনুভব করলাম। চোখ খুলে দেখলাম, তিনি আর কেউ নয়, আমারই দুলাভাই।

আমাকে গভীরভাবে তিনি আদর করতে লাগলেন। সম্মান হারানোর ভয়ে আমি চিৎকার না করে তাকে ছাড়াতে বৃথা চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি মুহূর্তের মধ্যে ব্রা, ব্লাউজ টেনে ছিড়ে আমাকে মাটিতে ফেলে দিল।

ধীরে ধীরে বশ মানতে লাগলাম। তিনি ধীরে ধীরে আমাকে উলঙ্গ করে ফেললেন। এতে এক অন্য রকমের সুখ পেতে থাকি।

তিনি এক সময় আমাকে বাধ্য করেন তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে।

ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাই।

জ্ঞান আসে আবার জ্ঞান হারাই।

কিন্তু আমাকে তিনি মুক্তি দেন না।

এভাবেই আমাকে ধর্ষণের পর তিনি একটা দামি শাড়ি উপহার দেন। কিন্তু আমি যা হারিয়েছি সেটা কি দামি শাড়ি দিয়ে পূরণ করা যায়?

ঠিকানাবিহীন

টুকরো কাহিনী

– এমএম ওবায়দুর রহমান

এক.

আমি তখন খুবই পিচ্চি। ক্লাস ফোরে পড়ি। আমার বয়েসী খালাতো বোন শান্তা এসেছে আমার বাড়িতে বেড়াতে। বিকেলবেলা ছোট একখানা লাল শাড়ি ব্লাউজবিহীন পরে এসে আমার পাশে দাড়ালো সে।

বললাম, তুই বড়দের মতো শাড়ি পড়েছিস কেন?

সে তখন হাসি দিয়ে বললো, আমি কি পিচ্চি নাকি? আমার ভাবী বলেছেন, আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি।

শাড়ি পরলেই মেয়েরা বড় হয়?

মুখে তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়ে বললাম, কচু! বড়রা কতো কিছু পারে, তুই কি তা পারিস?

ভেবেছিলাম সে বুঝি দমে যাবে।

কিন্তু না, সে আমার কাছে এসে আরো গর্বের সঙ্গে বললো, ভাইয়া আর ভাবী লুকিয়ে যা করে আমি তাও করতে পারি।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি করে?

মুহূর্তের মধ্যে শান্তা আমারে জড়িয়ে ধরে কয়েকটা চুমু দিল।

আমি এতো অবাক হলাম যে কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না।

শান্তা বললো, শোন বাদুর আমি আরো একটা জিনিস দেখেছি, কিন্তু এখুনি তা করছি না। তবে প্র্যাকটিস তোর ওপর হবে।

বিস্মিত হলাম।

সে বড় মেয়েদের মতো কোমর দুলিয়ে চলে গেল।

দুই.

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বড়ভাই শহরে থাকেন। প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার বাড়ি আসেন। আর প্রতি বৃহস্পতিবারই কেবল আমার ভাবী শাড়ি পরে। অন্যদিন সালোয়ার। পরদিন খুব ভোরে সেই শাড়ি বাড়ির উঠানে রোদে শুকানো হতো। ভাবীর সঙ্গে ভালো ভাব ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করেই ধরা খেলাম।

ভাবী পাচ মণ ওজনের এক চড় দিয়ে বললেন, খুব পেকে গেছো, না?

চড় খেয়ে অবাক হলাম। কিন্তু বুঝলাম না এতো সহজ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চড় দিলেন কেন ভাবী?

তিন.

স্থানীয় স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ি। অল্প বয়েসি এক ম্যাডাম ছিলেন আমাদের। ইংরেজি পড়াতেন। দেখতে খুবই সুন্দরী তিনি। ম্যাডামের স্বামীও অন্য স্কুলের টিচার ছিলেন। ম্যাডাম খুব রূপ সচেতন ছিলেন। খুব সাজগোজ করতেন। আমাদের সহপাঠী অনেকেই ম্যাডামকে রাতে স্বপ্ন দেখতো। একদিন আমরা সবাই আবিষ্কার করলাম ম্যাডামের শাড়ির পেট বরাবর উচু। আমাদের মধ্যে বদের হাড্ডি বলে পরিচিত ইমরান ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলো, ম্যাডাম কি বাচ্চা দেবেন?
ম্যাডাম এসে ব্ল্যাকবোর্ডে তাকালেন। কিছু না বলে ডাস্টার দিয়ে লেখাটা মুছে ফেললেন। তারপর চলে গেলেন। এই ঘটনার পর ম্যাডাম আর আমাদের পড়াতে আসেননি।

চার.

লেখাপড়া শেষ। রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি। এলো ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যথারীতি বিএনপির পক্ষ নিয়ে ভোট চাইতে নামলাম।
একদিন গ্রামের এক মহিলার কাছে ভোট চাইতেই তিনি বললেন, তোমাদের নেত্রী চুল কাটায়, চুল ফোলায়, ভ্রূ ওঠায়, পাতলা শাড়ি পরে। মাথায় অল্প শাড়ি দেয়।
বললাম, তাহলে কি আপনি স্বেচ্ছাচারী এরশাদকে ভোট দেবেন? তিনি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, এরশাদ তো লুচ্চা।
শেখ হাসিনা মোটা শাড়ি, বড় হাতার জামা পরে আপনি বুঝি এজন্যই শেখ হাসিনাকে ভোট দেবেন? তিনি বললেন, শেখ হাসিনা তো সন্ত্রাসী নেত্রী। তার মুখ দিয়ে অশ্লীল কথা বের হয়।
তাহলে? এবার তিনি হাসলেন। তারপর বললেন, ভাই, তোমরা কিছু মনে করো না। ভোটার লিস্টিতে আমার নাম ওঠেনি। উঠলে তোমাদের ধানের শীষেই ভোট দিতাম। আমার স্বামীও ধানের শীষে ভোট দেবেন। আসলে ভোটার হইনি বলে মনকে এসব কথা বলে বোঝাই। ভোট দেয়ার শখ আছে আমার।
আমরা সবাই অবাক হলাম মহিলার কথায়।

পাচ.

রাজনীতি করি বলে শান্তার অনেক বকাঝকা খেতে হয়। নির্বাচনের আগে সে আমাকে দিয়ে ওয়াদা করিয়েছিল যে, বিএনপি এবার জিতলে পরদিন থেকে পুরো এক সপ্তাহ তাদের বাড়িতে বেড়াবো। অক্টোবরের ১ তারিখে বিকেলে ভোট কেন্দ্র থেকে বাড়িতে গিয়ে দেখি শান্তা আমাদের বাড়ি। আমি বলি কি রে, আমার না তোদের বাড়িতে যাবার কথা। তাহলে তুই কেন এলি! ব্যাপার কি?
মুচকি হেসে সে বললো, আমি জানি এবার বিএনপি জিতবে। তাই আনন্দটা শেয়ার করতে এলাম।

বিকেলে সে সুন্দর করে সাজলো, পড়লো টকটকে লাল শাড়ি।

রুমে একা পেয়ে জড়িয়ে ধরে বললাম, কি রে, পরীর মতো সেজেছিস কেন? আমার যে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।

সে বললো, ছোটবেলার কথা মনে আছে? প্রথম যেদিন শাড়ি পরলাম, তোকে চুমু দিতেই তুই কেমন মুখ কালো করে রাখলি...। আমি উচ্চস্বরে হাসতেই সে বললো, হাসবি না বাদুর।

উল্লেখ্য, আদর করে *বাদুর* বলে ও।

বললাম, হঠাৎ এই কথা মনে করলি কেন?

সে বললো, সেদিন বলেছিলাম না, আমি আরো একটা জিনিস শিখেছি। আজ সেটাই তোর সঙ্গে করবো। তুই এখন ক্লাবে যেতে পারবি না, বাসায় টিভি দেখবি। শান্তা আমার বন্ধুদের বললো, সারাদিন রোদে ঘুরে ভাইয়ার মাথা ব্যথা। সে যাবে না।

অনেক রাত। বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। চার দলের বিজয় হচ্ছে দ্রুত। আমার মনের ভেতর নতুন কিছু শেখার ইচ্ছাও প্রবল হচ্ছে। এমন সময়ে শান্তা হাজারো চুমুতে আমাকে সিক্ত করলো। এক সময় তার শাড়ি ধীরে ধীরে শরীর থেকে নেমে পড়লো নিচের ফ্লোরে। আমি তার নগ্ন রূপ দেখে আশ্চর্য হলাম। নারীরা এতো সুন্দরও হয় বুঝি? তারপর শান্তা আমাকে যে সমুদ্রে সাতার কাটা শেখালো, সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না।

শিবচর, মাদারীপুর থেকে

চিঠি

–মোহাম্মদ ফিরোজ কবির

আমি এমনি এক লেখক যার জীবনে স্মরণীয় এমন ঘটনা শাড়ি নিয়ে ঘটেনি। তবে অল্প লেখাপড়া জানা এক মহিলা তার প্রবাসী স্বামীকে নিজের কথা, পারিবারিক অবস্থা এবং দুটো শাড়ি চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। এ মহিলার ভাষাজ্ঞান, বিশেষ করে দাড়ি, চিহ্ন ব্যবহারের সঠিক ধারণা আদৌ নেই। মহিলা ভুল দাড়ি, চিহ্ন ব্যবহৃত যে চিঠিখানা প্রবাসী স্বামীকে লিখেছিলেন, তার সুরতখানা নিম্নরূপ :

ওগো স্বামী,

সারাটা জীবন শুধু বিদেশেই কাটালে এই ছিল। আমার কপালে আমার পা। আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে উঠানটা। জলে ডুবিয়া গিয়াছে ছোট খোকা। স্কুলে যেতে চায়না ছাগলটা। শুধু ঘাস খেয়ে ঝিমাইতেছে তোমার মা। পেটের অসুখে ভুগিতেছে বাগানটা। আমে ভরিয়া গিয়াছে ঘরের চালা। স্থানে স্থানে ফুটাইয়া গিয়াছে গভীর পেট। দেখিয়া মনে হয় বাচ্চা দিবে করিমের বাপ। রোজ আধাশের দুদ দেয় মেজবউ। রান্না করিতে গিয়া হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছে কুকুর ছানা। সারাদিন লেজ নারিয়া খেলা করে বড় খোকা। দাড়ি কাটিতে গিয়ে গাল কাটিয়া ফেলেছে টেপির মা। প্রসব বেদনায় ছটফট করিতেছে টেপির বাপ। বার বার ফিট হইয়া যাইতেছে ডাক্তার। সাহেব আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। আমার

ব্যবহার করা শাড়ি ছিরে গেছে একটি দুইটি। শাড়ি নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি অবশ্যই বাড়িতে আসিবে না। আসিলে দুঃখিত হইবো।

ইতি

তোমার স্ত্রি

কুলসুম বীবী।

মুংরইল, সাপাহার নওগা থেকে

[কেবল মজা উপভোগই নয়, এ চিঠির বোল্ড করা শব্দগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখার বিষয়। চিঠিতে দাড়ি, চিহ্ন ব্যবহারের বিভ্রাট ছাড়াও বানানগত এবং সাধু-চলিত ভাষারীতির মিশ্রণগত ভুল রয়ে গেছে। এমন ভুল প্রতিনিয়ত আমরা করছি বলে পরীক্ষায় বাংলাতে এতো কম নাম্বার পাই। চিঠির আনন্দটুকু উপভোগের পরে শুদ্ধ করে লিখে দেখতে অনুরোধ করছি পাঠক পাঠিকা সবাইকে।]

-লেখক

ঈদে

– মনির হোসেন হেলাল

১৯৯১ সালের রমজান মাসের ঈদ ছিল বিয়ের পর আমাদের প্রথম ঈদ। তখন চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানায় সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করি। আর আমার নববিবাহিতা বৌ চাকরি করে ঢাকায় বিসিআইসি হেড অফিসে। নতুন বিয়ে করেছি সেই অজুহাতে ঈদের দিন দশেক আগেই ছুটি নিয়ে ঢাকা চলে আসি। বৌকে নিয়ে তার পছন্দ মতো ঈদের শাড়ি কিনবো এ কথা ভেবে চট্টগ্রাম থেকে ঈদের শাড়ি কিনলাম না।

একদিন সকালে বকশি বাজারের শ্বশুরবাড়ি থেকে রিকশায় চড়ে বৌকে নিয়ে বের হলাম শাড়ি কেনার উদ্দেশে। বাসার কাছে হওয়ায় প্রথমেই গেলাম নিউ মার্কেটে। এ দোকান সে দোকান ঘুরছি। অন্তত তাকে খুশি করার জন্য হলেও বৌয়ের সঙ্গে আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে নানান রঙ-বেরঙের শাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখছি। একান্ত বিজ্ঞের মতো মাঝে মধ্যে শাড়ির কোয়ালিটি নিয়ে দুই একটা মৃদু মন্তব্যও করছি। শাড়ির বাজেটটা আগে থেকে জানা ছিল বলে শাড়ি দেখার আগে বৌ দামটা দেখে নিতো। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর দুজনেই বুঝতে পারলাম যে, নিউ মার্কেট থেকে আমাদের পছন্দের শাড়ি কেনা সম্ভব নয়। নিজের আর্থিক দৈন্যতার জন্য কিছুটা হলেও মন খারাপ হলো।

মাথার উপরে খা খা রোদ। দুজনেই রোজা রেখেছি। এরপর কোথায় যাবো ভাবছি। বৌ বললো, চলো, গাউসিয়া মার্কেটে যাই।

নিউ মার্কেটের উল্টো দিকেই গাউসিয়া। গাউসিয়ার ভিড়ের কথা ভেবে গলা শুকিয়ে এলো। কিন্তু উপায় কি! শাড়ি তো কিনতেই হবে। লোকজনের, বিশেষ করে ঈদের বাজারে মজা করতে আসা

উঠতি বয়সের তরুণদের ধাক্কাধাক্কি থেকে কোনোমতে বৌকে আগলে রেখে শাড়ির দোকান পর্যন্ত এসে পৌছালাম। খিদে, পিপাসা, ঠেলাঠেলি আর গরমে চোখে তখন সর্ষে ফুল দেখছি।

লোকজনের ভিড়ে ভারী হয়ে যাওয়া গুমোট বাতাসে দাড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় শাড়ি চয়েস করা আমার কাছে নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হলো। বৌকে বললাম, দেখেশুনে একটা পছন্দ করে নাও।

বরাবরই আমার একটু কড়া রঙ পছন্দ। আর তার পছন্দ হালকা রঙ। কাজেই দুজনের যৌথ পছন্দের শাড়ি পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিল। অবশেষে মনে মনে সারেন্ডার করে তার পছন্দের একটা শাড়িকে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সমর্থন করলাম। কেনার জন্য দামাদামি শুরু করলাম। ঈদ উপলক্ষে দাম একটু বেশি হবেই। মনকে এমনি প্রবোধ দিয়ে শাড়িটা কিনে ফেললাম।

ততোক্ষণে বেলা চারটা বেজে গেছে। দেরি না করে বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় ফিরে হাত মুখ ধোয়ার আগেই আমার শাশুড়িকে ডেকে বৌ বললো, আম্মা দেখেন তো, শাড়িটা কেমন হয়েছে।

শাশুড়ি খুব উৎসাহ নিয়ে প্যাকেট খুলে দেখা শুরু করলেন।

ওমা! নতুন শাড়ি ছেড়া কেন? আমাদের চোখের সামনে শাড়ির ছেড়া অংশ মেলে ধরে শাশুড়ি বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। রাগে, দুঃখে নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছা করলো। আমার অবস্থা দেখে বৌ বলে উঠলো, তুমি বাসায় থাকো, আমি আম্মাকে নিয়ে শাড়িটা পাল্টে আনি।

অমত করলাম না।

ইফতারের খানিক আগে মা-মেয়ে শাড়ি নিয়ে ফিরে এলো। যেহেতু দোকানদার টাকা ফেরত দেয়নি তাই বাধ্য হয়ে ওই দোকান থেকেই শাড়ি আনতে হয়েছে। ইফতারের পর বৌ আমাকে শাড়ি দেখাতে লাগলো। মুখে যতোটা সম্ভব উৎসাহ দেখালাম যে, খুবই চমৎকার শাড়ি হয়েছে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত ভালো শাড়ি কিনে এনেছে। শাশুড়ির এমন আত্মতৃপ্তিমূলক মন্তব্যে জোর সমর্থন জানিয়ে গেলাম।

কিছুদিন আগে রমজানের ঈদ গেল। কুরবানির ঈদ গেল। পছন্দ মতো শাড়ি কেনার পয়সা পকেটে থাকা সত্ত্বেও শাড়ি কিনতে পারিনি। এর কারণ হলো সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হোয়ালা নামক যে ছোট্ট শহরটিতে আমরা থাকি সেখানে কোনো শাড়ির দোকান নেই। ঈদ আসে ঈদ যায়। নিউ মার্কেট আর গাউসিয়া যাওয়া হয় না।

হোয়ালা, অস্ট্রেলিয়া থেকে

শীতল

– রাশেদা আফরোজ ঝর্না

জীবনে বয়সসন্ধির পর থেকে কতো পার্বন আর কতো অনুষ্ঠানে যে শাড়িতে নিজেকে সাজিয়েছি তার হিসাব নেই। তবে সেদিনের সেই শাড়িটা যেন স্বর্গের কারিগর দিয়ে বোনানো। তাই তো তার চোখে ছিল বিস্মিত, মোহাবিষ্ট চাউনি। এবং আমার সর্বাঙ্গে লাজুক নম্রতা। শাড়িটা ছিল তারই দেয়া

উপহার। ঈদ উপলক্ষে পরেছিলাম আমার জন্মদিন বারো জানুয়ারিতে। সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তার বাসায়।

খালি বাড়িতে সে এবং আমি। মনে হলো যেন আমাদের কল্পিত সংসার। ও ধীর পায়ে এগিয়ে এলো আমার কাছে। তুলে দিল শাড়ির আচলটা আমার মাথায়। আমি যেন সত্যি তার বৌ হয়ে গেলাম। আনন্দে আমার চোখ বুঝে এলো। আমার ঠোটে তখন তার ঠোট যেন ব্যাকুল হয়ে কি খুজছে। সেদিন তার প্রশংসিত দৃষ্টিতে আমি যেন হয়েছিলাম সর্বকালের সেরা সুন্দরী। সেই উন্মাতাল দিনগুলোতে সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতার ফোকর গলে যখনই দুজনার দেখা হতো তখনই পথে–ঘাটে সুন্দর শাড়ি পরিহিত কাউকে দেখলে সে বলতো, আমার বৌকে ওই শাড়িটায় দারুণ লাগবে। আমি কপট অভিমানে গাল ফোলালে সে বলতো, আমি তো দেখছি শাড়িটা, নারীটা নয়। আমার মানসী তো আমারই পাশে।

তখন আমাদের প্রেমের দিন, অথচ তার মুখ থেকে *বৌ* শব্দটা শুনলে যেন অবচেতনে সাজানো সংসারে পেয়ে যেতাম নিজেকে। ভাবতাম বিয়ের পর তার ইচ্ছা মাফিক শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে রেখে সত্যি তার বৌ হবো।

স্বপ্ন আমার পূর্ণ হয়েছে। বৌ হয়েছি তার। কিন্তু স্বপ্নের মূল্য যে বাস্তবতা দিয়ে দিতে হয় এখন দিনের সূর্যের মতো স্পষ্ট, বরং আরো অনেক কাছে আমরা। তবুও একটা অদৃশ্য দূরত্বের নদী যেন আমাদের দুজনের মাঝে সদাপ্রবাহিত যা বিয়ের আগে এতো কাছে থেকেও টের পাইনি। তার চোখে এখন আর সেই দৃষ্টি নেই। কখনো আমাকে অবাক করে দিয়ে একটা শাড়ি এনে বলে – না, এটা আমার বৌ–এর জন্য। আমার শাড়ি, গয়না, বাড়ির তাগিদ নেই। কিন্তু এখনো যে আমি তার চিন্তা চেতনার মাঝে সব সময় থাকি। শুধু এতোটুকুই দেখতে ইচ্ছা করে, হয়তো আমি চাইলে আমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে সে বলবে শপিং করতে। আমি চাই আমার জীবনের প্রতিটি ঘটনায় তার ছোয়া থাকুক। সে দেখে বলুক, ওটা তোমায় মানাবে না, এটা নাও বা এই রঙটা নাও, ওটা না। আমি যে তার অস্তিত্বের মাঝে নিজেকে বিলীন করেছি তা হয়তো ভুলেই গেছে। তাই ওর অবহেলায় নিজেকে প্রাণহীন পুতুলের মতো মনে হয়।

এখন তো প্রতিটি রাত তার সঙ্গের মধ্যে কাটে। তবুও দিনের আলো যখন তাকে কর্মব্যস্ত করে তখন মনে হয়, আমি যেন তার বুক থেকে নির্বাসিত। অথচ বিয়ের আগে ও এক মুহূর্তের জন্য আমার হাতটা ধরলেও মনে হতো, এই যেন জীবনের চরম পাওয়া, এরপর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা যায়। কারণ তার সেই স্পর্শের কাছে নিজেকে অর্পণ করে পেতাম পূর্ণতা। এখন সে যেন দায়সারাভাবে নিয়ম পালন করে যায় যেখানে ভালোবাসার নিবিড়তা যেন কল্পনা মাত্র। এই নির্জীব শীতলতা আমাকে স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বাস্তবতার আস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলেছে।

তবে কি স্বামীর চেয়ে প্রেমিকের চোখেই রমণী, রমনীয় ভালোবাসা দেখতে পায়! এই যদি হয় তবে কোনো একদিন নারীরা শাড়ি পরে ঘরকন্নার লক্ষ্মী হয়ে আর আসবে না, আমার নারীত্বের পূর্ণতা তারই মাঝে। জানি না এই সত্যটুকু তাকে কখনো বোঝাতে পারবো কি না। তবে আমার বৌ হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, আমার দাদি শাশুড়ির মসলিন শাড়ি যা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। গাঢ়

বেগুনি জমিনের স্বর্ণ জরির কাজ করা শাড়িটি ম্যাচ বক্সে রাখা যায়, প্রেমিকা থেকে স্ত্রী হয়ে এটাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মিরপুর, ঢাকা থেকে

লাবণী

– মোহাম্মদ ইমরান তালুকদার

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমরা চারজন বন্ধু ছিলাম। শুধু রাত ছাড়া সারাদিন আমরা এক সঙ্গে থাকতাম। অন্যরা আমাদের গ্রুপের নাম দিয়েছিল *চার রত্ন।* আমাদের বন্ধুত্ব এতো গাঢ় ছিল যে, কোনো কিছুই আমাদের প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাড়ায়নি। আমি অর্ণব, লাবণী, রাব্বী আর সাব্বির মিলে আমাদের চারজনের গ্রুপ। আমরা এতো ঘনিষ্ঠ ছিলাম যে, লাবণী যে একটা মেয়ে তা কখনো আমাদের মনে হতো না। আবার আমরা যখন লাবণীর বাড়ি যেতাম তখন লাবণীর বাবা–মায়ের চোখেও তেমন কিছু দেখিনি। তারা আমাদের যথেষ্ট ভালোবাসতেন।

আমাদের এমএ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বাড়ি বসে ভাবছি রেজাল্টের পর কি করবো। এর মধ্যে একদিন লাবণীর চিঠি এলো। লাবণীর বিয়ে। ছেলের ঢাকা বাড়ি এবং ভালো ফার্মে, ভালো বেতনের চাকরি করে। আমাদের যেতে হবে বিয়ের তিন দিন আগে অর্থাৎ হলুদের দিন। খুশিতে মন ভরে গেল। বিয়ের তিন দিন আগে লাবণীর বাড়ি হাজির হলাম। আমি পৌছানোর কিছুক্ষণ পর রাব্বী আর সাব্বির এলো। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম, লাবণীকে শাড়ি দেবো। আমরা লাবণীকে নিয়ে বাজারে গেলাম এবং দুটো শাড়ি কিনলাম। আমরা উঠে আসবো এ রকম সময় নীল রঙের একটি শাড়ি দেখে লাবণী দাম করলো। দোকানদার যে দাম বললো তা আমাদের সাধ্যের অনেক বাইরে। আর তাছাড়া দুটো শাড়ি কেনার পর আমরা প্রায় নিঃস্ব। লাবণী পরে নেবে বলে উঠে এলো। শাড়িটি বড়ই চমৎকার ছিল। শাড়িটি লাবণীকে দিতে পারলাম না তার জন্য দুঃখ হচ্ছিল। তবে সামর্থও ছিল না।

বিয়ের পর আমরা যে যার মতো চলে এলাম। তারপর মাস ছয়েক দারুণ ব্যস্ততা। এর মধ্যে আমার ভাগ্য বদলেছে। ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছি এবং আমার জাপানে একটা স্কলারশিপ হয়েছে। জাপান যাবার দিন সন্ধ্যায় ঢাকায় লাবণীর বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে লাবণী এতো খুশি হয়েছিল যে, সে যেন আকাশের চাদ হাতে পেয়েছে। আমার ফ্লাইট ছিল রাত একটায়। এর মাঝে লাবণীর বর এলো। বেচারা খুবই ভালো মানুষ। খুব হাসিখুশি আর খুবই মিশুক।

রাতে খাওয়া–দাওয়ার পর চলে আসবো এমন সময় লাবণী বললো, অর্ণব আবার কবে আসবে?

বললাম কবে আসবো তা বলতে পারছি না। তবে মনে হয় তিন বছরের আগে নয়। তারপর বললাম, আমি আজ জাপান যাচ্ছি।

শুনে লাবণীর চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করলো। আনন্দের জল দেখার মতো। দেখতে দেখতে আমারও চোখে জল এসে গেল।

এ রকম সময় জামাইবাবু আমার কাধ চাপড়ে বললেন, শালাবাবু, এতো ভালো একটা খবর এতো দেরিতে বললে?

তারপর...

তিন বছর পর জাপান থেকে সবে মাত্র ফিরেছি। এর মধ্যেই আমার জন্য পাত্রী দেখা হয়ে গেছে এবং বিয়ের দিন–তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। ঠিক হলো বিয়ের বাজার হবে কলকাতায়। বাজারের জন্য কলকাতায় যাবে আপা আর দুলাভাই। আমি চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য আগে চলে গেলাম মাদ্রাজ। ঠিক হলো আমি নির্দিষ্ট তারিখে আপাদের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হবো। ডাক্তার দেখানোর পর ঘুরতে ঘুরতে একটি বড় শাড়ির দোকানে ঢুকলাম। শাড়ি দেখতে দেখতে নীল রঙের একটি শাড়ি খুব পছন্দ হলো আর সঙ্গে সঙ্গে লাবণীর কথা মনে পড়ে গেল। চোদ্দ হাজার আটশ রুপিতে শাড়িটি কিনে খুব গোপনে ব্যাগে রেখে দিলাম। বাড়ি ফিরে নিমন্ত্রণের কার্ড দেয়ার পালা। ঠিক করলাম আগে লাবণীকে বলে তারপর রাব্বী আর সাব্বিরকে বলবো। শাড়িটি নিয়ে ঢাকায় লাবণীর বাসায় গিয়ে তাকে দেখেই চমকে উঠলাম। লাবণীর পরনে এক রঙ্গা শাড়ি।

তারপর লাবণী বললো তোমার জামাইবাবু চার মাস হলো গত হয়েছেন। কিডনীর সমস্যা ছিল। ধরা পড়ার পর আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু...।

সেদিন লাবণীকে শাড়িটি দিতে পারিনি। আমার স্ত্রীকেও দিইনি। প্রতীক্ষায় আছি, শাড়িটি কবে লাবণীকে দিতে পারবো।

কাজলা, রাজশাহী থেকে

সুন্দরী

– মিলি আনোয়ার

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরান সহিত মোর।
চণ্ডীদাস

বাঙালি নারীর সবচেয়ে প্রিয় পোশাক শাড়ি। যখন কোনো সুন্দরী নারীর দেহে লেপ্টে থাকে তখন শাড়ি হয়ে যায় কবিতার মতো সুন্দর। সুন্দরী নারী এবং শাড়ির মধ্যে নিবিড় মিল খুজে পায় কবি ও সাহিত্যিকরা। এ নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক গান কবিতা ও ছন্দ।

শাড়ির আদি নাম *শাটী* বা *সারঙ্গ।* প্রাচীনকালে এটি ছিল দুখণ্ড পোশাক। সেলাইবিহিন এক খণ্ড নিম্নাঙ্গে এবং এক খণ্ড উর্দ্ধাঙ্গের আব্রু রচনা করতো। মনে করা হয়, মানব সভ্যতার শুরু থেকেই

শাড়ির প্রচলন ছিল। তার প্রমাণ *মহাভারত*–এ বর্ণিত দ্রৌপদীর শাড়ির বস্ত্র হরণ, রামায়ণ–এ উল্লিখিত সীতার দেহবাস এবং অজন্তার কিছু কিছু চারুকৃতিও শাড়ির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগ থেকেই শাড়ি একপ্রস্থ বস্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তখনকার কয়েকটি শাড়ির নাম, অগ্নিকূল, আসমান তারা, মেঘ ডুম্বুর, গঙ্গাজলি, কনকলতা ইত্যাদি। একেক দেশে একেকভাবে শাড়ি পরা হয়। শহরে মেয়েরা কুচি করে শাড়ি পরে। পর্দানশীনরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে আবার গ্রামের মেয়েরা এক প্যাচ দিয়ে পেচিয়ে শাড়ি পরে। এবং কেউ কেউ সামনে আচল এনে ভারতীয় রীতিতে শাড়ি পরে।

অজন্তার চিত্রকর্মের অনুরূপ নাভি বের করে শাড়ি পরাকে অজন্তা স্টাইল বলা হয় আধুনিক যুগে। ইদানীং ইসলামি সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে শাড়িকে নারীর পোশাক হিসেবে অনুমোদন করে না।

যদিও বাঙালি মুসলমান নারীর শাড়িই প্রধান পোশাক ইসলামি শরিয়া আলেমদের অনেকের মতে শাড়ি দেহকে আড়াল করার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন মাথার ঘোমটা পড়ে গেলে, হাত উচু করলে মেয়েদের পেট, কোমর দেখা যায় কিংবা রিকশায় উঠার সময় মেয়েদের হাটু পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ইত্যাদি। সম্ভবত পাকিস্তান সরকার প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে সে দেশে শাড়িকে অনৈসলামিক পোশাক হিসেবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তবে বাঙালি ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে শাড়ির বিকল্প নেই। পোশাকটি কতোটা সুন্দর শোভন তা ব্যক্তি রুচির ওপর নির্ভর করে।

আমাদের দেশে মহিলা রাজনীতিবিদ, পুলিশ, প্রশাসন, বিচার ও অন্যান্য পেশার উচু থেকে নিচু পর্যন্ত সকলে শাড়ি পরেন। যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া খুব সুন্দর এক রঙা শিফন জর্জেট শাড়ি পরেন যা তার রুচি ও সৌন্দর্যের প্রকাশ। আবার বিরোধী নেত্রী শেখ হাসিনা পরেন পৃন্টেড সিল্ক, জামদানি যা তাকে চমৎকার মানিয়ে যায়। নারীরা এখন বিভিন্ন ধরনের পেশার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। ফলে দিন দিন শাড়ির উপযোগিতা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া আক্রমণ এবং আত্মরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই শাড়ি অন্তরায় সৃষ্টি করে। যেমন সাতরানো, বিশেষ যান চালনা, খেলাধুলা, সশস্ত্র কর্মপরিচালনা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে শাড়ি পরা সম্ভব নয়। তবুও সবশেষে বলতে হয়, শাড়ি বাঙালি মেয়েদের অতিপ্রিয় আর তাই বিয়ের শাড়ি, হলুদের শাড়ি প্রতিটি মেয়ের কাছে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। এ জন্য তো কবি বলেছেন–

নীলাম্বরী শাড়ি পরে
কোন রূপসী যায় গো...
আমার মন হরি
পায়ে ধরি সখী পায়ে ধরি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

কে দায়ী

–সুব্রত আচার্য

ফটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমররা পিকনিক করতে শ্রীমঙ্গল যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি রওনা হবে। বাসের সামনের দিকের কিছুটা আরামদায়ক দুটো সিটে আমাদের ব্যাগগুলো রেখে একটু হাওয়া খেতে আমি ও মাহবুব বাস থেকে নেমে পড়লাম। কিছুটা দূরে দাড়িয়ে দুজনে মিলে দেখছি কারা আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

নীল শাড়ি পরা এক অপরূপা সুন্দরীকে দেখে তো আমার একটু হার্টবিটই মিস হয়ে গেল। পাশের মেয়েটাও নেহায়েত মন্দ না। কিন্তু কে ওই অপ্সরী তা মাহবুবকে জিজ্ঞাসা করলাম, না সে জানে না। যথাসম্ভব নতুন ভর্তি হয়েছে ফার্স্ট সেমিস্টারে। এদিকে বাস ভেপু বাজাচ্ছে। এখনি ছেড়ে দেবে। দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠলাম।

কিন্তু একি! অপ্সরী যে সবাস্তব আমাদের সিটে! বিষয়টাকে ভালোভাবে ম্যানেজ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। মুখে রাগ ভাব ধরে রেখে বাক-বিতণ্ডা শুরু করে দিলাম যদিও মনে মনে খুশিই হয়েছি। বেশিক্ষণ লাগলো না, মীমাংসা হয়ে গেল। ঠিক হলো অস্পরী এবং আমি এ সিটেই বসবো।

মাহবুব আর ওই মেয়েটা পেছন দিকের এক সিটে। বুঝলাম অপ্সরীর অনেক জেদ। একবার যখন বসেছে তখন উঠে গেলে নিজে ছোট হয়ে যাবে হয়তো এই ভেবে এখানে আমার পাশে বসতে রাজি হয়ে গিয়েছে।

বসলাম তো কিন্তু কোনো সুযোগ যে পাচ্ছি না। এদিকে মেয়েটার মুখভঙ্গি দেখেও মনে হচ্ছে আমার ওপর মোটেই খুশি নয়। এক সময় সুযোগ পেয়ে গেলাম। অল্প কথায়ই বুঝতে পারলাম মেয়েটা বেশ আলাপী। চমৎকার, মিষ্টি ওর কণ্ঠস্বর। আর কথা বলার ভঙ্গিটা আরো চমৎকার। রূপা তার নাম। ইকনমিক্সে ভর্তি হয়েছে। বাড়ি হবিগঞ্জে।

ওর সঙ্গে আলাপে বুঝতে পরলাম আমি ইমপ্রেসড। মনে মনে হয়তো ভেবেছিলাম এ রকম চমৎকার মেয়ে যদি আমার কেউ হতো? কিন্তু কে জানে রূপাই একদিন আমার সবচেয়ে কাছের মানুষে পরিণত হবে? পিকনিকের পরিচয় আমাদের আরো কাছাকাছি এনে দেয় এবং এক সময় শুরু হয় আমাদের দুজনের একান্ত পথ চলা। আমাদের প্রতিজ্ঞা হয় জীবনের বাকিটা পথ এভাবেই দুজনে মিলে কাটাবো।

ডিসেম্বরের ১০ তারিখ ছিল রূপার জন্মদিন। এ উপলক্ষে ওকে কি গিফট দেয়া যায় সেটা ভাবছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম শাড়ি দেবো। প্রথম দিন ওর সঙ্গে পরিচয়ের দিনও সে নীল শাড়ি পরেছিল যে শাড়ি ওকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছিল আমার কাছে। তাছাড়া রূপাও শাড়ি খুব পছন্দ করে। যে কোনো অকেশন-এ সে শাড়িই পরে।

নীল রঙ দেখে একটা রাজশাহী সিল্ক কিনে ফেললাম ঠিক ছিল যে ড্মল্যান্ড পার্কে নটার দিকে রূপা আসবে। বসে আছি তো আছিই। নয়টা থেকে বারোটা। ধ্যাৎ, শালা মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মেসে এসে দেখি কার মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে ওর মামার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সবাই মিলে মামাকে দেখতে গিয়েছে।

রূপা আর ওর ছোটভাই বাসায় চলে আসবে বিকেলের দিকে, বাবা-মা রয়ে যাবেন। আমাকে বাসায় দেখা করতে বলেছে রূপা। ঠিক করলাম যাবো না। সুন্দর সকালটা নষ্ট করে দেয়ার জন্য রূপার ওপর রাগ হলো। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে শাড়িটা পাঠিয়ে দিলাম যাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রূপার হাতে পৌছে যায়।

শাড়িটার এর পরের পরিণতি কি হয়েছিল তা রূপার কাছে শোনা। রূপার বাবা রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। মেজাজটা এমনিতেই চড়া। তার ওপর রক্ষণশীল, এখন ধর্মেকর্মেই মন বেশি। শাড়িটা পরার পর সোজা ওর বাবার কাছে। ওর বাবা মা সেদিন এক সঙ্গেই চলে এসেছিলেন। তিনি সব কিছু দেখে রূপাকে শুধু বললেন, কাল থেকে তোর বাইরে যাওয়া বন্ধ।

তিন দিন পর রূপা যখন কোনো রকমে লুকিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো তখন ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা দুজনের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু করার মতো তখন কিছুই ছিল না। তার উপর রূপারা সপরিবারে দুই দিন চট্টগ্রামে ওর বড়চাচার বাসায় বেড়াতে যাচ্ছে। রূপাকে শুধু বলতে পেরেছিলাম, দেখে নিও পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কে জানতো, এ দেখাই ছিল আমাদের শেষ দেখা। রূপাকে ওর চাচার বাসায় রেখে সেখানেই পাত্রস্থ করা হয়। বিন্দুমাত্র আভাস পাইনি। দিন পনেরো পরে খবরটা শুনতে পাই। কাকে দোষী করবো ভেবে পেলাম না। মনে পড়লো শাড়িটার কথা। শাড়িটা যদি এভাবে না পাঠাতাম তাহলে হয়তো ওর বাসার কেউ আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারতো না এবং এর পরিণতিও হয়তো এ রকম হতো না।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট থেকে

সোনার বাংলা

– আহমেদ সুজন

স্টেশনে নামতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল জমির আলীর। অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তঘাটের অবস্থা ভালো না। অন্ধকারে পথ হাতড়েই তাকে বাড়ি পৌছাতে হবে। অনেক দিনের একটা ইচ্ছে টর্চলাইট কেনার। কুলিয়ে উঠতে পারে না। ট্রেনটা বিলম্বে না পৌছালেই সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে পারতো। বাড়ির কাছে পৌছেই পুকুরে নেমে হাত-পা ধুয়ে স্যানডালটা পরে উঠানে পা রাখতেই মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, *জমির আইছস, একবারে খাওয়া-দাওয়া শেষ কইরা ঘরে যা।*

সবাই জানতো আজ জমির আলী আসবে। মাস ছয়েক হলো জমির আলী শহরে পিয়নের কাজ নিয়েছে। পিয়ন হলে কি হবে সব রকমের কাজই তাকে করতে হয়। বেতন যা পায় তা দিয়ে সংসারে সবার মন ভরাতে পারে না। সবার চাহিদা মিটিয়ে নিজের স্ত্রী ছমিরনের জন্য কিছু কিনতে ইচ্ছা হয়। সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু ছমিরনের জন্য বাজার করতে জমির আলীর লজ্জাবোধ হয়। সে চায় না ছমিরন সবার সমালোচনার মধ্যে থাকুক।

একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই কিছুদিন আগে লোক মারফত একটা শাড়ি কিনে পাঠিয়েছিল। শাড়ির অভাবে ছমিরনের বাইরে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খেতে বসে রুটি আর সজনে ডাটা দেখে জমির আলীর মনটা খারাপ হলো। কোথায় গিয়ে থালা ভর্তি ভাত এবং মায়ের হাতের সালুন দিয়ে পেট ভর্তি করে ভাত খাবে। তা না করে রুটি খাওয়া। রাগটা কাকে দেখাবে? এক সময় মা বলে উঠলেন, *ছমির, টাউনের অবস্থাও কি আমাগো মতন খারাপ, না আরো বালা। এতো কষ্ট কইরা দেশটা স্বাধীন করলি রুটি খাওনের লাইগ্যা।*

জমির আলী সান্ত্বনা দেয়, *মা এই তো মাত্র দেশ স্বাধীন অইলো, সব কিছু ঠিক অইয়া যাইবো।*

খাওয়া শেষে শোবার ঘরে শুয়ে শুয়ে জমির আলী ভাবছে। এতো প্রশ্নের জবাব সে কোথা থেকে দেবে। সে তো মাত্র একটা পিয়ন। যুদ্ধে গিয়েছিল সবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। তখন কি সে জানতো একটা জমির আলী সবার মুখে হাসি ফোটানোর কেউ না।

ছমিরন পান নিয়ে এলো। বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে ফিশফিশিয়ে। পাশের ঘরেই মা বাবা সবাই। জমির আলী ভেবেছিল ছমিরন কিছুদিন আগে পাঠানো শাড়িটা পরে আসবে। না, ছমিরন পুরনো শাড়িই পরে আছে। কৌতূহল এড়াতে পারলো না জমির আলী। জিজ্ঞাসা করলো, গত সপ্তাহে পাঠানো শাড়িটা পাওনি?

ছমিরন মাথা নাড়লো। বোঝা গেল জবাব হ্যা।

এটা তো আটপৌরে শাড়ি, তুইলা রাখার মতো শাড়ি না। তুমি ঘরের বাইর হইতে পারো না বইলা তাড়াতাড়ি কিইন্যা পাঠাইছিলাম। এটা পরনি কেন? শাড়ি বুঝি পছন্দ হয় নাই? জমির আলী এক নাগাড়ে বলে গেল।

হ, পছন্দ হইছে। তবে পরতে শরম লাগে।

কেন?

শাড়িটা বড়ই পাতলা। ঘাটে গেলে সবাই তামসা করে। সুন্দরী শাড়ি পরলে নাকি সোনার বাংলা দেহা যায়। আইচ্ছা, তোমরা যুদ্ধ কইরা একটা দ্যাশ বানাইয়া ফালাইলা, মা-বইনের লাইগ্যা ইনডিয়ান শাড়ি বাদে আর কোনো শাড়ি আনতে পারো না?

জমির আলী উপরের দিকে তাকিয়ে ঘরের চালের বাশের বুনন দেখে আর ভাবে, জমির আলী তো সরকার না। সরকার হলে বাণিজ্যমন্ত্রীকে নির্ঘাত বরখাস্ত করতো।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, আজিমপুর, ঢাকা থেকে

একান্ত গোপন

– তাজকেরা খানম নীলু

উপহার, উপহারই তা সে যাই হোক। টাকায় এর দাম নির্ধারণ করতে যাওয়া অনুচিত, অন্যায়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোলাগা, ভালোবাসা। বিশেষ সময়ে, বিশেষ জনের কাছ থেকে পাওয়া একটি গোলাপও হতে পারে অমূল্য উপহার। উপহারের সঙ্গে জোর-জবরদস্তির

সম্পর্ক নেই। তাই উপহার দিতে ভালো লাগে, উপহার পেলে মন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু উপহার কখনো কখনো যে মন খারাপের কারণও হতে পারে, তা মনোদুঃখের যোগান দিতে পারে এমন নজির কম নেই।

আমার রক্তসম্পর্কের এক আত্মীয়। জন্মগতভাবেই তার কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারি, নেয়ার অধিকার রাখি। কিন্তু সে আশা করি না। কারণ কিতাবে গরু থাকলে গোয়ালেও থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এই আত্মীয় আমার বিয়েতে একটি শাড়ি উপহার দেন। আমার আত্মীয়ের আর্থিক দীনতা না থাকলেও মনের দীনতা ছিল ষোলআনা। তাই বিয়ে বাড়িতে আপনজনরা যখন শাড়ির সমালোচনা করলো তখন চুপ থাকলাম। ভাবলাম, সব শাড়ি আমাকে পরতে হবে এমন কথা নেই। প্যাকেটের ওপর লেখা আত্মীয়ের নাম তুলে ফেললাম।

বিয়েতে পাওয়া অন্যসব উপহারের সঙ্গে সেই শাড়িটি আমার স্বামী দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, শাড়িটি কে দিয়েছে।

বলেছি, ঠিক জানি না।

বিয়েতে পাওয়া কিছু উপহার, বিশেষ করে শাড়ি কাছের আত্মীয়দের প্রেজেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু সেই শাড়িটি নিতে কেউ রাজি হলো না। আমিও বিব্রত হতে চাই না বলে নিজের কাছে রাখিনি, দূর সম্পর্কের এক গরিব আত্মীয়াকে গছিয়ে দিয়েছি তার ইচ্ছাতেই।

আসলে উপহার পাওয়া শাড়িটি আমার মনকে ব্যথিত করেছিল, শ্রদ্ধাবোধকে ধোকায় ফেলেছিল। এই আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাড়িটির কথা মনে পড়ে যায় যা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের বিঘ্ন ঘটায়।

মাঝে মধ্যে এখনো আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করেন সেই রহস্যময় শাড়িটা কে দিয়েছিল। গোপন কেউ নয়তো?

আসলে শাড়িটা নিয়ে তখনকার কিছুটা গুঞ্জন তার কানেও গিয়েছিল। কিন্তু পুরোটা বুঝে উঠতে পারেননি। তাই আমাকে খুচিয়ে কিছু বের করতে চান। কিন্তু আমি তো জানি, আমার সেই আত্মীয়ের একটা ইমেজ আছে তার কাছে। রহস্য উন্মোচন হলে সেই ইমেজ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। তাতে কারো কোনো ক্ষতি না হলেও আমার উচু কণ্ঠ নিচু হবে, মাথাও ঝুকে যাবে লজ্জায়।

সত্যি বলছি, আমার সেই আত্মীয়টি যদি আমাকে একটি গোলাপ, নিদেন পক্ষে একটি বই অথবা কিছুই না দিতেন, তাহলে কিছুই মনে করতাম না। কারণ আশাই যেখানে করি না সেখানে নিরাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অথচ সেই শাড়িটি দিয়ে তিনি শুধু আমাকে কষ্ট দেননি, অপমানিতও করেছেন।

আমার স্বামী হয়তো আবারও জানতে চাইবে, শাড়ির রহস্য খুচিয়ে হয়তো আমার ভেতরটা উসকেও দেবেন, এরপরও রহস্যময় শাড়ি রহস্য হয়েই থাকবে। কারণ আমি চাই, এটা থাক আমার একান্ত গোপন কষ্ট হয়ে।

চট্টগ্রাম থেকে